বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

ইমেজ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রংপুর

৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি চলছে

বিষয় সমূহঃ

- ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা-ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

সেন্ট্রাল ম্যাট্রস, রংপুর

সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি রংপুর

৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি চলছে

বিষয় সমূহঃ

- ডিপ্লোমা-ইন-প্যাথলজি
- ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং
- ডিপ্লোমা-ইন-ফার্মেসী
- ডিপ্লোমা-ইন-ডেন্টাল

বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সরাসরি পরিচালিত

ক্যাম্পাস পরিদর্শন করার পর ভর্তির সিদ্ধান্ত নিন।

ক্যাম্পাস ঠিকানা

বাসা নং-৪১, রোড নং-০১, নবাবগঞ্জবাজার রোড, মুন্সিপাড়া, রংপুর,
ফোন: ০১৭৫৫-০৬৭২১০, ০১৭৫৫-০৬৭২১১, ০১৭৫৫-০৬৭২১২
Website:imagerealestateltd.com,E-mail: imagerel@yahoo.com

■ গুনগুন ■ লাঙল-ফলা সংখ্যা-২০১২

গুনগুন

একটি অনিয়মিত সাহিত্যপত্র

পঞ্চম সংখ্যা
(লাঙ্গল ফলা ২০১২)

গুনগুন

একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গুনগুন-কে

শুভেচ্ছা

* নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
* পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
* আপনার ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পাঠান।
* বৃক্ষরোপন করুন, অন্যকে রোপনে উৎসাহিত করুন।

ধন্যবাদান্তে

এ.কে.এম আব্দুর রউফ মানিক
মেয়র
রংপুর পৌরসভা, রংপুর।
ফোন : -৬৫১৮৬, ৬৪৭৪৪ (বাসা)
ফ্যাক্স : ৬৪২৬৮
মোবাইল : ০১৮১৯-১২০৮৭৭

পৌরসভার জরুরি ফোন নম্বরসমূহ ঃ

এ্যাম্বুলেন্স	:	৬৫৬৯৯
সচিব	:	৬৪৯৮৯
বিদ্যুৎ শাখা	:	৬৭১০৪
বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল	:	৬৩৫২৪
পানি শাখা	:	৬৪২৬৮
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শাখা	:	০১৭১৮৭০৩৮৫৭

web site : www.rangpur-municipal.org.bd

গুনগুন

একটি অনিয়মিত সাহিত্য পত্র

পঞ্চম সংখ্যা (লাঙল-ফলা ২০১২)

(একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সব বড় মনের মানুষ
যারা অসুন্দরের কাছে পরাজিত হয়নি
অসুন্দরের জন্য অশনি সংকেত
আর
পরিচয়হীন সেই সব ছিটমহলবাসী
যাদের আর্তনাদ কারো কানে বাজে না
যাদের আন্দোলন আজ নিষ্ফল

কই
আছিতো খারাপ না
হয়তোবা আগের মত ভালো না
কই
কাঁদি নাতো
হয়তোবা আগের মত হাসি না

গুনগুন
একটি অনিয়মিত সাহিত্য পত্র
পঞ্চম সংখ্যা (লাত্তল-ফলা ২০১২)

প্রকাশকাল:
মে ২০১২, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

সম্পাদক:
উমর ফারুক
শিক্ষক, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

সহযোগী সম্পাদক:
আফিফা ইশরত চেতনা

সম্পাদনা পরিষদ :
আবু হুরাইরা রাকিব
তানজিমা হক
বিভূতী ভূষণ মাহাতো
মোঃ সোহানুল হক
মোঃ তৌহিদ নূর শাফি
আল্পনা আকতার জাহান

প্রচ্ছদ:
প্রত্যয় ফাহাদ

মুদ্রণ:
মুদ্রণ শৈলী, রংপুর
০১৭১২০৫৭৪৩৭

প্রকাশনায়:
গুনগুন
(একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)
৪১৮, কবি হেয়াত মামুদ ভবন
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
Web Site: www.goongoon.yolasite.com
Email: faruque1712@gmail.com
মুঠোফোন: ০১৭১৬৬০৭৯২৬, ০১৭২৬৮৬৪৮৯৮

ক্রম

প্রবন্ধ (০৬ - ২৩)
শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজ / প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক ০৬
বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ / মুহম্মদ আলীম উদ্দীন ১০
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ / ড. মোঃ নাজমুল হক ১২
কী সুন্দর অন্ধ / সোহরাব দুলাল ১৭
তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ / সাদিয়া আরেফিন ঝিনুক ২২
বাংলাদেশ অর্থনীতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা / শাহজাহান আলী ২৩
গল্প (২৪ - ৪৩)
তারা / সীমান্ত অসীম ২৪
স্মৃতিতে ঢাকা ভালোবাসা / নওরিন তাসনুমান ৩১
বৃষ্টি কন্যা / আফিফা ইশরত চেতনা ৩৪
বিবর্ণ স্বাধীনতা / মনোয়ার হোসেন ৩৫
The Labyrinth / Shahnaz Yasmeen ৩৬
রম্য
একজন ইডিয়েট বলছি / একজন রানা ৪৪
স্মৃতিচারণ
গুনগুন নিয়ে লেখা / কেনা সানা ৪৬
শিশু পাতা (৪৮ - ৪৯)
স্বপ্ন / সুমন্তা সায়রী প্রেয়া ৪৮
আকাশ ও মেঘ / প্রজ্ঞা সিদ্দীক ৪৯
কবিতা (৫০ - ৬৪)
বসন্ত ও আমি / মোঃ মোরশেদ হোসেন ৫০
লিমেরিক / মোহাম্মদ শাহ আলম ৫১
অমর হবে তুমি / মোঃ ফেরদৌস রহমান ৫২
মানুষ এখনো আদিম / তুহিন ওয়াদুদ ৫৩
দূরত্ব / রিষিণ পরিমল ৫৪
তবুও নৈঃশব্দের হা / বিমলেন্দু রায় ৫৫
ফুরিয়ে যাচ্ছে মানবিক সভ্যতার আলোটুকু / জাকিয়া সুলতানা চৈতী ৫৬
বৈশাখী মেলা / শিরিন আক্তার ৫৬
সময়ের বাতাবরণ / কায়সার আলম ৫৭
স্তব্ধতা / মোঃ হামিদুল ইসলাম ৫৯
বৈশাখী বিকেল / আহমেদ বুলবুল ৬০
নীরব অপেক্ষা / সাদিয়া কাওছার ৬১
আমি / মোঃ সোহানুল হক ৬২
ঘুড়ি / মোঃ খোরশেদ আলম ৬২
অসমাপ্ত গল্প / সুমন রহমান ৬৩
নীল কুয়াশার ঘোমটা / মোঃ শফিউল ইসলাম পলাশ ৬৪
তুমি ভাবলে কি করে / মোঃ রাফিউল ইসলাম ৬৪
গুনগুন পরিবার ৬৫
আগামীর প্রেরণা ৬৬

সম্পাদকীয় নয়

বিবেকের বোতামগুলো আলগা হয়ে যায় অথবা জং ধরে পালিয়ে যায় দূরে কোথাও। রাব্বি ও রবিউল। একজন মা'কে চিনতে শরীরের গন্ধ উপভোগ করে আর অন্যজন মায়ের গন্ধ চেনার সুযোগই পেল না। একজন মায়ের কোলেই নিরাপদ রইল এবং অন্যজন নতুন মা পেল। স্বাভাবিক ঘটনায় আমরা শিহরিত হলাম। হাস্যকর সমাজ। প্রতিটি অধিকার নিশ্চিত করতে হয় আন্দোলন করে। অভাবের সংসারে একটি শিশুর মূল্য নির্ধারিত হয় দু'হাজার টাকা। ঘুম ভাঙা থেকে ঘুমানো অবধি একজন মায়ের সকল আয়োজন তার সন্তানকে ঘিরে। বড় বড় স্বপ্ন দেখে সময় পার করাটা তার অভ্যেস হয়ে যায়। এই স্বপ্ন বিলাসী মায়েদেরকে এক সময় পরিচয় করিয়ে দেয় তারই সন্তান। সংজ্ঞাহীন একটি ভালোবাসার নাম মাতৃত্ব। সেই মাতৃত্ব যখন নিলামে ওঠে তখন নীল হয় আমাদের বোধের জায়গাগুলো।

আঁধার ডিঙিয়ে আবার আলোর মুখ দেখা। অসংখ্য সমালোচনার জবাব না দিতে পারা গুনগুন প্রতিবন্ধী নয়, অপূর্ণতা নিয়েই সাহিত্য অঙ্গনে তার নীরবতা ভাঙলো, পঞ্চম বারের মত। শক্ত শব্দের মালায় যখন আমাদেরকে গুনতে হয়, গুনগুনকে আগে তার জায়গা স্পষ্ট করতে হবে। তখন বিনম্র জবাব, গুনগুন সকল অখাদ্য খায় সমাজকে মুক্ত করতে আর সুন্দরকে উপভোগ করে নতুন সুন্দর জন্ম দিতে।

অমলেশ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কোন দিন একা একা চাঁদ দেখবে না। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কোন শিশু কাঁদলে সেও সমস্বরে চিৎকার করে উঠবে। মাকে কষ্ট দেবেন না, এমন প্রতিজ্ঞাও করেছিল এক দিন। অমলেশ এখন ফুট পথে থাকে। ঘুম ভাঙলেই তাকে আকাশ দেখতে হয়। তার শূন্য পেটের চিৎকারে শিশুটি ভয়ে ফোপাতে চায়। আর তার মা, চোখে না দেখতে পাওয়া অন্য কোন এক বৃদ্ধা, কপালে বৃদ্ধাশ্রমটিও জোটেনি বেচারির। এমনই কথা না রাখতে পারা মানুষের কাতার ক্রমাগত যখন বেড়ে চলেছে তখন দ্বিধান্বিত হওয়াই সবচেয়ে সহজ পথ।

শ্রদ্ধেয় ড. মোঃ তাজুল ইসলাম স্যারকে বলা। আমাদের ভুলকে কোন যুক্তির বাঁধনে বাঁধতে চাই না। কোন আত্মপক্ষ সমর্থনও নয়। শুধু জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে কষ্ট দেওয়ার অধিকার গুনগুনের থাকা উচিত নয়। গুনগুন কোন অবস্থাতে সেই অনধিকার চর্চাও করতে পারে না। কার দায়, কী হতে পারতো, কী হলে ভালো হতো তা নিয়ে কোন খণ্ডনও নয়। অতএব অনিচ্ছাকৃত কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ নয়, শুধুই ক্ষমা প্রার্থনা।

ঘুমালে রাত ছোট হয়ে যাবে, সেই শঙ্কায় এক প্রিয়তমা সারা রাত পাহারা দিলো প্রেমিককে। তার সুখো-স্মৃতির রাত দীর্ঘ হলো। আমাদের সুখ-অনুভূতিগুলো স্থায়ি করতে সুখ-প্রহরী দরকার, যারা সুখ-রজনীগুলো নির্ঘুম পাহারা দিতে পারবে। সুখের স্থায়িত্ব হবে অনন্ত। বপিত সুখের বিনিময়ে উৎপাদিত হবে নতুন সুখ। চারদিক ভরবে সুখ-শ্যামলতায়।

আপনার সীমাহীন প্রত্যাশার কাছে কৃতজ্ঞতা আর বরাবারের মত ইতিবাচক সমালোচনার জন্য খিড়কি খুলে রাখা।

উমর ফারুক

প্রবন্ধ

শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজ

প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক

প্রতিদিন আমি যা পড়ি, যা শুনি, যা দেখি দিনান্তে তা ডায়েরিতে লিখে রাখার অভ্যাস আমার দীর্ঘদিনের। এছাড়া সপ্তাহে শুক্রবার বা যে কোন ছুটির দিনে খবরের কাগজ, সাময়িকী, ম্যাগাজিন-জার্নালগুলোর অংশবিশেষ কেটে রাখার অভ্যাস এখনও রয়েছে। সুযোগ পেলে এগুলো পড়ার চেষ্টা করি। লেখালেখিতে তথ্য উপাত্তের কাজেও লাগে এসব। এমন কাটা কাগজেরই একটা ফাইল করেছি এবং সেটি শুধু মাত্র শিক্ষাবিষয়ক। সেই ফাইলে রাখা, ২০০৬ সালে ৩ আগস্ট প্রথম আলোতে প্রকাশিত আনু মুহাম্মদ– এর একটি লেখা পড়ে আকৃষ্ট হলাম। লেখাটির শিরোনাম 'শিক্ষকদের আন্দোলন: অগ্রাধিকারের প্রশ্ন'। এটি পড়ে আমার মনে হয়েছে এদেশের অনেক কিছু বদলেছে। কিন্তু বদলেনি শিক্ষকদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র, শিক্ষকদের উপর ওপরঅলাদের (নিয়ন্ত্রক শক্তির) তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চিত্র। আনু মুহাম্মদ তাঁর লেখাটি শুরু করেছেন এভাবে "ছোটবেলাতেই এই গল্প শুনেছিলাম। এখনো মাঝে মধ্যে মনে পড়ে, মনে পড়ার অবস্থা থাকার কারণেই। বোধ করি কোনো শিক্ষকই বলে থাকবেন গল্পটি। গল্পটি ছিল ব্রিটিশ আমলের। সে সময় স্কুল ইন্সপেক্টর সাধারণত থাকতেন ব্রিটিশ। এক মফস্বলের স্কুল তিনি পরিদর্শন করবেন। তটস্থ সবাই, চারদিকে সাজ সাজ রব। রাজ প্রতিনিধি এসেছেন। শুধু রাজ-প্রতিনিধিগণ, শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সাহেব। কে যে কী করবেন, কীভাবে দাঁড়ালে, কীভাবে বসলে, কীভাবে কথা বললে সাহেব খুশি থাকবেন কিংবা ক্ষেপে যাবেন না তা নিয়ে হুলস্থুল। যে যার শোনা জ্ঞান দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করছেন। স্কুল নতুন করে পরিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। সবাই যার যার সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরেছেন। তারপরও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। যার যার সাধ্যমতো ইংরেজি ঝালাই করছেন। শিক্ষার্থীদের কী ধরণের প্রশ্ন করা হতে পারে সেগুলো ঠিক করে উত্তর খোঁজা হচ্ছে। পুরো স্কুলে টেনশন।

সাহেব এলেন, সাঙ্গ-পাঙ্গসহ। প্রভুদের যা আচরণ হয়, প্রথম থেকেই ধমক আর ধমক। ত্রস্ত সবাই। গত কয়েক দিন প্র্যাকটিস করা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে জানা জিনিস, ইংরেজি কথা বোঝাও যাচ্ছে না সবকিছু। উল্টাপাল্টা উত্তর হচ্ছে। ক্লাসে ক্লাসে ঘুরলেন সাহেব, তাঁর দাপটে কাঁপতে থাকলেন শিক্ষক। যে যত বড় কর্তা, তাঁর দাপট তত বেশি। ধমক আর রাগই তো তার ভূষণ। শিক্ষক সেখানে কেবলই কর্মচারী। এক ক্লাসরুমে সাহেব যা-তা বললেন শিক্ষককে, সবার সামনে, কুৎসিতভাবে। কোনো কথা তিনি মানতে রাজি নন। চলে গেলেন সাহেব। সবাই চুপ।

অনেকক্ষণ পর। ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে শিক্ষক বললেন, 'তোদের একটা অঙ্ক করতে দেই। কর। যে সাহেব এসেছিলেন তার আয় কত ব্যয় কত আমার জানা নাই। তবে এতটুকু জানি যে, মাসে তার কুকুরের পেছনে খরচ হয় ৮০ টাকা। অন্যদিকে মাসে একজন স্কুল শিক্ষক বেতন পান ১০ টাকা। আর আমরা জানি, কুকুরের চারটি ঠ্যাং। তাই যদি হয়, তাহলে এখন তোরা বের কর একজন শিক্ষক সাহেবের একটা কুকুরের কয়টা ঠ্যাংগের সমান?' পুরো ক্লাস স্তম্ভিত। এ কেমন অঙ্ক দিলেন স্যার? এই স্যার তো অচেনা। কারও কাগজ-কলম একসঙ্গে হয় না। স্যার তাকিয়ে আছেন শিক্ষার্থীদের দিকে। মুখে রাগ, অপমানে একাকার। চিৎকার করে উঠলেন স্যার, বিকৃত হয়ে গেল কণ্ঠ, 'করিস না ক্যান অঙ্কটা, বল কয়টা, কয়টা ঠ্যাং?' তারপরই ভেঙ্গে পড়লেন দোর্দণ্ড প্রতাপে স্যার, তার এই পরাজয়ে ভেঙ্গে পড়া এর আগে কখনো দেখেনি শিক্ষার্থীরা।

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশ ছেড়েছেন ১৯৪৭ সালে। এরপর আমরা শাসক হিসেবে পেয়েছি পাকিস্তানিদের। গায়ের রং বদলালেও মেজাজ-মর্জি ছিল তাদেরও ঐ ব্রিটিশ সাহেবদের মতই। তারপর এল এদেশের মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা। আশায় বুক ভরে উঠলো অন্যান্যদের মত এদেশের শিক্ষকের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীদের সারিতে ওঠালেন, চাকুরির স্থায়িত্ব এল, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলো, বেতন বাড়লো। এটা ছিল এক বিরাট অর্জন। বঙ্গবন্ধু ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাধীন জাতির উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধুর তৃতীয় ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১১-১৯৭৩)। এ আদেশের ভিত্তিতে আজও ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এ আদেশ একটি অনন্য মডেল। এ আদেশ/অধ্যাদেশ দ্বারা বঙ্গবন্ধু প্রকৃত শিক্ষাবিদদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। এজন্য এ অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত তিন জনের একটি প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর ভিসি নিয়োগ দিবেন বলে বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দেয়া সেই সুযোগ অপব্যবহার করা হয়েছে এবং এক সময়ে সে ধারণা থেকে দূরে সরে আসা হয়েছে। ড. কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্টও বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তাই আজও রয়ে গেছে সেই ব্রিটিশ শাসনামল বা পাকিস্তানি শাসনামলের মতই।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় চলছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। যাঁদের পয়সা কম তাঁদের ছেলেমেয়েরা পড়ে সরকারী প্রাথমিক স্কুলে, সেখানে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ। আর শিক্ষকদের অবস্থা? স্কুলে এসে ঘরের দরজা খোলা থেকে ঘর-দরজা, টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ ঝাড়া-মোছা করার দায়িত্বও শিক্ষকদেরই। কেননা আজ অবধি এই চল্লিশ বছরেও স্কুলে একজন পিয়ন নিয়োগের কথা ভাবতে পারেনি আমাদের বিগত দিনের সরকারগুলো। এমনকি যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগ পাচ্ছেন না। কেননা লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও মৌখিক পরীক্ষার নামে চলছে দলীয় দৃষ্টিকোণ এবং অর্থের বিনিময়ে যাচাই-বাছাই।

এবারে দৃষ্টি দেয়া যাক মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকদের দিকে। এ পর্যায়ে শিক্ষকদের আর্থিক দুর্দশা শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকেই। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের নায়কতো ছাত্রসমাজ। ছাত্রদের দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য স্কুলগুলোতে ঠিকমত ক্লাসও হচ্ছিলনা। ছাত্রদের মাইনে দিয়েই তো স্যারদের বেতন দেয়া। ফলে, বাকী পড়তে শুরু করলো ছাত্র বেতন, অনিয়মিত হতে থাকলো স্যারদের বেতনও। এল ১৯৭১ সাল। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিযুদ্ধে। এদেশের শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ হলো পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং তাদের এদেশীয় দালাল রাজাকার, আলবদরদের হত্যা-নির্যাতনের টার্গেট। স্কুল কলেজ আছে কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক নেই বললেই চলে। আবারো শিক্ষকদের আর্থিক বিড়ম্বনা। কেননা ছাত্র বেতনেইতো তাদের বেতন দেয়া। দেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের বেতন মাফ করে দিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মহান। কিন্তু শিক্ষকরা, তাঁদের চলবে কী ভাবে? প্রাসঙ্গিক এ বিষয়টি নিয়ে কেউ ভাবেনি তখন। এর চরম মাশুল দিতে হয়েছে শিক্ষকদের। সমাজে তাঁদের ছিল একটি সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান। কাজেই তাঁরা না পারলেন কারো কাছে হাত পাততে, না পারলেন অন্য কোন ভাবে জীবিকার তাগিদ মেটাতে। সে এক দুর্বিসহ অবস্থা। পরবর্তীতে অবশ্য সরকারের সুমতি হয়েছে। শিক্ষকরা এখন আর ছাত্র-বেতনের ওপর নির্ভরশীল নন। কিন্তু সেখানে রয়েছে আর এক চিত্র। হাতে গোনা কিছু বিষয়ের শিক্ষক যাঁরা শ্রেণী কক্ষে ইংরেজি কিংবা গণিত পড়ান তাঁরা বেছে

নিয়েছেন প্রাইভেট টিউশনি। তাঁদের রোজগারও খারাপ না। তবে এজন্য তাঁদের পরিশ্রমও করতে হয় অনেক। কিন্তু বাদ বাকী ৯৮ ভাগ শিক্ষকের অবস্থা খারাপ। কলেজ শিক্ষকদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। অধিকাংশ সরকারী কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। এমন অনেক কলেজ রয়েছে যেখানে অনার্সও পড়ানো হয় এবং যেখানে সাতজন শিক্ষক থাকার কথা সেখানে রয়েছে মাত্র একজন বা দুইজন শিক্ষক। ছাত্রদের কাছে পয়সা নিয়ে তা দিয়ে (সেমিনার ফি, উন্নয়ন ফি নামে) বেসরকারী কলেজের জুনিয়র শিক্ষক কিংবা পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু এখনও ফলাফল প্রকাশ পায়নি বা কোথাও চাকুরী হচ্ছেনা এমন কাউকে দিয়ে ক্লাসগুলো নেয়া হয়। এসব ধার করা শিক্ষকদের দিয়েই চলছে মফস্বল কলেজগুলোর অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষাদান। সহজেই অনুমান করা যায়, তাঁরা কি শেখাচ্ছেন এবং ছাত্ররা কী শিখছে।

সম্প্রতি বেসরকারী কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স খোলার সিদ্ধান্ত– নিয়েছে সরকার। বলা চলে হিড়িক পড়েছে অনার্স কোর্স খোলার। কিন্তু কেউ কী একবারও ভেবে দেখেছেন যে, কোর্সগুলো পড়াবেন কে? দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি ক্লাসে পড়াচ্ছেন তাঁদের অনেকেই অনেককিছু ভুলে গেছেন। তাছাড়া কলেজগুলোতে নেই মানসম্মত গ্রন্থাগার, নেই হাল আমলে প্রকাশিত বই-পুস্তক, জার্নাল। সরকার কলেজগুলোর জন্য শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, অনার্স পড়াতে হলে ৭ জন শিক্ষক থাকতে হবে একটি বিষয়ে। কিন্তু তাঁদের বেতন আসবে কোথা থেকে সে বিষয়ে কারো মাথাব্যথা নেই– নেই কোন চিন্তা বা পরিকল্পনাও। এমনিতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যাওয়ার পর থেকে কলেজগুলো থেকে যারা পাশ করে বের হচ্ছে, তাদের মেধার কোথাও মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। তারপর যদি অনার্স-মাস্টার্স কোর্স যত্রতত্র খোলা হয় এবং না পড়িয়েই শুধু পরীক্ষা নিয়ে সনদ দেয়া হয় তাহলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে মানুষের ধারণা হবে খুবই নেতিবাচক। এতে করে বেসরকারী কলেজগুলোর এবং শিক্ষকদের এখনও সামান্য সেটুকু সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে সেটুকুও থাকবেনা।

এবার আশা যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। আমাদের দেশে যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে এবং সেখানে যেভাবে শিক্ষাদান হচ্ছে তা নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। এগুলির না আছে নিজস্ব ক্যাম্পাস, না আছে যোগ্য শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। পার্ট-টাইম শিক্ষক দিয়ে চলছে অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, ডীন-এসব পদে দেশের কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, যাঁদের পরিচিতি আছে- তাঁদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়, শুধুই ইমেজ বৃদ্ধির জন্য। এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি সনদ কেনা-বেচার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বদনাম কুড়িয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত চলছে শিক্ষা বাণিজ্যিকিকরণ। গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এগুলোতে ভর্তি হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না।

এর বাইরে রয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক ইমেজ ও সুনাম অর্জন করতে পারেনি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মাথা তুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, অনেক ভিসি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে নিজ পদের ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা হানি করেছেন। অনেক ভিসি নিজেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা খোদ সরকারকেই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। অথচ ১৯৭৩ সালের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সিনেট মনোনীত প্যানেল থেকে নির্বাচিত ভিসি হলে সরকারকে এ দায় বহন করতে হতোনা।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল নয়। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুটি কয়েক শিক্ষকের কনস্যালটেন্সি করে বা অন্য কোনভাবে বাড়তি অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকলেও এঁদের সংখ্যা খুবই নগন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ান না। বেতন ভাতা ছাড়া তাদের বলতে গেলে উল্লেখযোগ্য কোন বাড়তি আয় নেই বললেই চলে।

শিক্ষকদের নিয়ে যত বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, তাঁদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা আগের মত নেই। বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সাথে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আচরণ ভীষণ অবমাননাকর ও দৃষ্টিকটু। এমনকি সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সাথেও তারা সুযোগ পেলেই অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। শুধু কি তাই? জনপ্রতিনিধিরাও যখন বেসরকারী স্কুল ও কলেজের সভাপতি হন তখন তাঁদের আচরণ দেখে মনে হয়না তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। তাঁদের লোভ-লালসা অনেক ক্ষেত্রে আমলা-প্রশাসকদেরকেও হার মানায়।

এমনকি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধারদের সাথেও সাধারণ শিক্ষকদের সম্পর্ক ভাল নেই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভিসির সাথে সাধারণ শিক্ষকদের এতটা দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে যে, তাঁরা ভিসির অপসারণের মত একদফা দাবিতে আন্দোলনে নেমে পড়ছেন। অধিকাংশ ভিসি একটি ক্ষুদ্র শিক্ষক-কর্মকর্তা গোষ্ঠী দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত থাকেন যে, সাধারণ শিক্ষকরা তাঁর নাগাল পান না বা পেতে দেয়া হয়না। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের চাওয়া-পাওয়াও তিনি বুঝতে পারেন না। ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অনেক ভিসি সরকারের নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে, গুটি কয়েক সন্ত্রাসী নেতাকে লালন-পালন করতে গিয়ে, ছাত্র ও শিক্ষকদের রোষাগলে পড়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদ্যাপীঠ না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। যেখানে থাকার কথা সত্য, সুন্দর এবং আলোকিত মনের মঙ্গলিক দীপ শিখা সেখানে বিরাজ করছে হানাহানি, মারামারি ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ। ফলে, সাধারণ মানুষের চোখেও শিক্ষক সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠছে, তা শিক্ষকদের জন্য শুভ নয়।

লেখক: ট্রেজারার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ আলীম উদ্দীন

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক
এই হোক শেষ পরিচয়
আর কিছু নয়-'

যাঁর এই পরিচয় সর্বাংশে সফল-পরিপূর্ণ সত্য তাঁর জন্ম তিথি চির নতুনের ডাক দিয়ে পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এসেছে। যিনি আমাদের মাঝে সত্যের মত জাগ্রত যাঁর কবিতা যার বিপুল সৃষ্টি সম্ভার আমাদের আনন্দের দোসর, দুঃখের সাথী বিপদে পরাভয় মন্ত্র। তাঁর কথায় ছন্দ গাঁথি সৌন্দর্য সাগরে অবগাহন করি এক কথায় বলা যায় আমরা তাঁর কথায় কথা বলি-আর তিনিই হলেন 'আমাদেরই লোক' রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। তাঁর সুদীর্ঘ ষাট বছরে অধিক সাহিত্য সাধনার সুবর্ণ ফসল বিপুল ও বিস্ময়কর। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রের চোখ বাঁধানো দীপ্তির মতই রাশি রাশি বিচ্ছুরিত। বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র অঙ্গনে তাঁর পদচারণা অবারিত। তাঁর সাহিত্য সাধনার সুদীর্ঘ কালে তাঁর ভাষাভঙ্গি এবং বক্তব্যে পরিবর্তন এসেছে বারংবার। সমগ্র রবীন্দ্র জীবন প্রকৃত পক্ষে যেন নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

বিপুল প্রাণ চঞ্চল এই পুরুষর দুর্লভ ক্ষমতা শুধু কবিতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না-সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে ছিল তার দীপ্তিমান স্বাচ্ছন্দ্য বিহার ছিল দুর্বার চলস্রোতে।

এই বিস্ময়কর কবি প্রতিভার সঙ্গে সে সময়ের পূর্ববাংলা এবং আজকের বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ়, বলা যায় আত্মার এমন কি রক্তেরও। এ ভূখণ্ডের নিসর্গের সঙ্গে তার মানুষের সঙ্গে যিনি জড়িয়ে ছিলেন সাময়িক ও অতিমানবিক ব্যাপ্তি ও নিবিড় তায়। তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধ ও পত্র পত্রাবলীতে এ অঞ্চলের মানুষের নিসর্গের বর্ণালী সৌন্দর্য বৈভবের বিপুল বিস্তার হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে চির জাগ্রত, চির নতুন। বাংলাদেশের প্রকৃতির মতই তিনি আমাদের কাছে চির শ্যামল। বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মার যোগ কতখানি ছিল তা পরিমাপ করা অসাধ্য। নিসর্গের সুধা তিনি পান করেছেন বাংলার মাটি হতে। তিনি তাই ছিন্ন পত্রাবলীর একটি পত্রে বলেন- 'আমি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, মানিনি কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি। বৈশাখের খর রৌদ্র তাপ, শ্রাবণের মুষল বর্ষণ পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা। মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দুলোকের শিল্পী প্রহরে নানা বর্ণের আলো ছায়ার তুলি।' আর এ সময়ে কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিরিশের কোটায় তখনই জমিদারীর কাজে তিনি আসেন শিলাইদহে এবং বাংলার প্রকৃতির ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে তার মনের শ্যামল প্রাঙ্গণ আলোড়িত হয়। তাই তার দীর্ঘ জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কেটে গেছে বাংলাদেশের শিলাইদহে।

সাজাদপুরে পতিসরে তেমনি তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারের একটি বিরাট অংশ রচিত হয়েছে এদেশের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে নিষিক্ত হয়ে। তাঁর সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথ প্রসারিত হয়েছে এদেশের মানুষের সংস্পর্শে। তবে তিনি সোনার তরী'তে সংশয় প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, এ তরী নিঃশেষে তার ফসল তুলে নেবে কিন্তু কবিকে তুলে নেবে কি? কবি তার ফসল 'থরে বিথরে' তরীতে তুলে দিয়ে তাঁকে তুলে নেয়ার মিনতি জানিয়ে বলেন-'এখন আমারে লহ করুণা করে' কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ একান্তরে তাকে আবারো তুলে নিয়েছিল এবং বাংলাদেশ হয়েছে তার সোনার তরী। সেই তরীতে তারা কবির ফসল যেমন নিয়েছে তেমনি কবিকেও করেছে তাদের নিত্য সঙ্গী। তাঁর স্থান চিরস্থায়ী ভাবে নির্ধারিত

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ

ড. মোঃ নাজমুল হক

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলাদেশের শিলাইদহে আসেন পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। ছিলেন বোটে। এরপর দুমাস পর দ্বিতীয়বার আসেন মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। প্রথমবার ছিলেন ১০ দিন। এরপর দু'মাস পরের বার তিনি বিখ্যাত শিকারী বিশ্বনাথের সাথে গিয়েছিলেন বাঘ শিকারে। সম্ভব তৃতীয় বার ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি আবার এসেছিলেন শিলাইদহে। সেবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী মৃনালিনী দেবী আর বড় মেয়ে মাধুরী লতা বেলা এবং পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, এসব ছিল নিছক বেড়ানো। বাংলাদেশের সঙ্গে তার যথার্থ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ১৮৯০ সালে। এ বছর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে জমিদারী দেখাশোনার ভার অর্পণ করেন। তার আগে জমিদারী দেখাশোনা করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ভাইটি যাকে বলে সংসারী-তা ছিলেন না। গান, বাজনা, নাটক, ছবি আঁকা আর সাংস্কৃতির কাজকার্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তিনি। মহর্ষি যখন রবীন্দ্রনাথকে এ দায়িত্ব প্রদান করলেন, নিকটাত্মীয়রা ভীষণ অবাক হয়েছিলেন। কবি, ভাবুক, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রেমী এই পুত্রটি জমিদারির কী বুঝবে! কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাদের সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথ একজন সফল জমিদারের মতই দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর উড়িষ্যায় তিনটি জমিদারি পাবনার শাহজাদপুর, রাজশাহীর কালীগ্রাম ও পতিসর এবং কুষ্টিয়া বিরাহীমপুর পরগণায় জমিদারি কিনেছিলেন। বিরাহীমপুর পরগণার জমিদারি কিনেছিল শিলাইদহে। বাংলাদেশের এই তিন অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবস্থান করেন ১৮৯০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। ১৯০১ সালে তিনি পরিবারসহ স্থায়ীভাবে চলে যান শান্তিনিকেতনে। তবে ১৯১০ সাল পর্যন্ত শিলাইদহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অব্যাহত ছিল।

অবশ্য আরো একটি সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর তাঁর বিয়ে হয় যশোর জেলার দক্ষিণ ডিহি গ্রামের বেণীমাধব রায় চৌধুরীর মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সাথে। বেণীমাধব ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জমিদারি এস্টেটের কর্মচারী। রবীন্দ্রনাথরা ছিলেন 'পিরালি ব্রাহ্মণ' বংশের পরিবার। সুতরাং তাদের সমমর্যদার ঘরে বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। মহর্ষি অনেকটা তড়িঘড়ি করেই রাজপুত্র তুল্য, উদীয়মান, খ্যাতিমান এই কবি পুত্রটির বিয়েটা সেরে ফেলেন। ঠাকুর বাড়িতে এলে ভবতারিণীর একটা অভ্রগোছের নামকরণ করা হয়-মৃণালিনী দেবী। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের একটুখানি সন্ধান করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ৫ সন্তান-২ ছেলে, ৩ মেয়ে। জেষ্ঠ্য মাধুরীলতা বেলা, জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৬ সালে। দ্বিতীয় সন্তান পুত্র, রথীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮৮ সালে। তৃতীয় সন্তান কন্যা রেণুকার জন্ম ১৮৯২ সালে। চতুর্থ সন্তান, কন্যা– মীরার জন্ম ১৮৯৪ সালে এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান পুত্র, শমীন্দ্রনাথ ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের সন্তান ভাগ্য ছিল ট্রাজিক ঘটনায় ভরা। তার ৫ সন্তানের মধ্যে তিন সন্তানই মারা যায় খুব অল্প বয়সে। মাত্র ১২ বছর বয়সে সদ্য বিবাহিত কন্যা রেণুকা যক্ষা রোগে, ১৩ বছর বয়েসে অতি আদরের ছোট ছেলে শমীন্দ্র কলেরায় এবং মাত্র ২২ বছর বয়সে বড় মেয়ে বেলা যক্ষা রোগে মারা যায়। ১৯০২ সালে এপেন্ডিসাইটিস রোগে, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অকাল মৃত্যুবরণের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুক ভরা যন্ত্রণা বহন করে আরো ৩৯ বছর নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন কলকাতার নাগরিক কোলাহল ছেড়ে নিভৃত গ্রামে আসেন তখন এদেশের পরিবেশ তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মনে হলো- 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী

হয়েছে বাংলাদেশের নিসর্গ মাটিতে, আত্মায়-তিনি এদেশে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছেন। তাই তার ১৯০৫ সালে এদেশের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় করে একাত্ত হওয়ার অনুভব সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'-বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারীর তত্ত্বাবধানে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয় ১৮৯১ সালে। এই পদ্মা বিধৌত শিলাইদহের এক প্রান্তে সে সময়ের বিখ্যাত মরমী কবি লালন শাহ'র আখড়া ছিল। লালন শাহ'র নাম ও তার মর্ম আলোড়নকারী গানের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। এবার বাস্তব মরমী কবি লালন শাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ তাঁর হলো। শুধুই তাই নয় তিনি লালন শাহের গান সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন জানা যায়, বামা চরণ ভট্টাচার্য নামক জনৈক কর্মচারীর সাহায্যে তিনি লালন শাহর আখড়া হতে ২১৭টি গানসহ অন্যান্য লোকগীতি, ছড়া সংগ্রহ করেন। তাঁর এ সংগ্রহের খাতাটি এখনও রবীন্দ্র সদনে সংরক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে বিশ্ব ভারতী প্রবাসী পত্রিকায় লালন শাহের সংগৃহীত গানগুলো ১৯১৫ সালে প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠেন। কবির অনেক সঙ্গীতে, কবিতায় লালনের গানের তত্ত্ব কথা ও সুর অজান্তেই প্রভাব বিস্তার করে।

বলা হয়েছে কবি জমিদারী তদারকীর কাজে বাংলাদেশের শিলাইদহে, সাজাদপুরে, পতিসরে অবস্থান করেছেন, বারবার আসা যাওয়া করেছেন এবং নৌকায় চড়ে পদ্মা ও চলন বিলের অপরূপ শোভা সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন অজস্র কবিতা, গান, গল্প আরো কত কি।

বাংলাদেশের ভূখন্ডের সংগে তথা তার নিসর্গের সংগে কবির যে কত নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ছিন্ন পত্রাবলীর পত্র সমূহে। এমনি একটি পত্র শিলাইদহে ১ অক্টোবর ১৮৯১ সালে লিখিত হয়েছে তার অংশ বিশেষ, 'বেলা উঠে দেখলুম চমৎকার রৌদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তলতল থৈ থৈ করছে।... পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।... স্তম্ভিত হৃদয় রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, অমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।

শিলাইদহ ২ আষাঢ় ১২৯৯ এ লেখা অপর একটি পত্রে বলেন... 'আমি প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি করে দিন আসছে, কোনটি সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে রাঙা, কোনটি ঘন ঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মতো প্রফল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য এবং এরা কি কম মূল্যবান।'

জানা যায় সাজাদপুরের কুঠিবাড়ির পুকুর ঘাটে বসে তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় গান-'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে'-রচনা করেছিলেন। এবং এই সাজাদপুরে তিনি তার বিখ্যাত 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি রচনা করেন। সাজাদপুর ২৯ জুন ১৮৯২ এর পত্রে বলেন- '....এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির এক তলাতেই পোস্টঅফিস ছিল এবং আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিত বাণীতে বেরোয় তখন পোস্টমাস্টার বাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জা মিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মনোরম নৈসর্গিক পরিমণ্ডলে বলেন, কবি তার জীবনের কতকথা, কততত্ত্ব যে বলেছেন তার ইয়াত্তা নেই। কবি তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে শিলাইদহ ৮মে ১৮৯৩-এ লেখা পত্রে বলেন- 'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মত বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাকদত্তা হয়েছিল... আমার আসল জীবনটি তার কাছে বন্ধক আছে'।

লেখক: সাহিত্যিক

আশ্চর্য সুন্দরী, তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এযে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা, তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।' (পত্রসংখ্যা ১০)

শাহজাদপুর, শিলাইদহ এবং পতিসরে অবস্থানের সময় রবীন্দ্রনাথ জমিদারি কাজ পরিচালনার অবসরে এই অঞ্চলের প্রকৃতি ও জনপদকে গভীরভাবে দেখার ও অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রকৃতি ও মানুষের জীবন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অবিচ্ছেদ্য। তিনি এক পত্রে লিখেছেন- 'এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো, আমি কত দূর-দুরান্তর, কত দেশ-দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম।'

সেই সব দিনে শিলাইদহ তাঁর কাজের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তাঁর বাস কখনো কুঠি বাড়ি কখনো বোটে। জীবনের পাঠ নেবার জন্য শিলাইদহ এবং তার আশপাশই হয়েছে তার পাঠশালা। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সাধারণভাবে আমার ধারণা বাবার গদ্য ও পদ্য দু'রকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে এমন আর কোথাও হয়নি। বাংলাদেশের যে রূপ বৈচিত্র্য, তার মধ্যে পেয়েছিলেন তিনি লেখার অনুকূল পরিবেশ। প্রবাসী পত্রিকায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে গীতা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, পিতৃদেব যদি আমাকে জমিদারির কাজে না পাঠাতেন তবে আমার সব লেখার দশা হতো মেয়েদের লেখা উপন্যাসের মতো। মেয়েদের ছোট করার জন্য এ মন্তব্য নয়। আসলে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে আটক থাকা এবং জগৎ সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের তুলনা করেছিলেন। শিলাইদহ শাহজাদপুর, পতিসরের তথা বাংলাদেশের অকৃপণ, উদার, মুক্ত ও দিগন্ত বিস্তারী অপরূপ লাবণ্যময়ী নিসর্গ তার জীবন ও দৃষ্টিকে করে দিয়েছে বিশাল; উন্মুক্ত করেছে হৃদয়ের বদ্ধ দরোজা, মনের খোলা জানালা দিয়ে প্রবল বেগে প্রবেশ করেছে পৃথিবীর সকল আলো, সকল বাতাস। কলকাতায় বা শান্তিনিকেতনে তিনি যখন সংসারে নানা অশান্তিতে ক্লিষ্ট হয়ে উঠতেন, তখন ছুঁটে এসে আশ্রয় নিয়েছেন শিলাইদহ শাহজাদপুর, পতিসরের প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোলে। হাফ ছেড়ে বলেছেন, অনেকদিন পরে জলের ধারা ও সবুজ মাঠের সংস্রব ও নির্জনতা পেয়ে আমি যেন নিজের সত্যকে আবার ফিরে পেয়েছি। এমনকি নোবেল পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, বিশ্ব আমাকে সম্মান দিয়েছে বটে কিন্তু আমি চিরতরে নিভৃত শান্তি থেকে বঞ্চিত হলুম।

রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশে অবস্থান এবং শিলাইদহ-শাহজাদপুর-কলকাতা যাতায়াত কাল ছিলো মোটামুটি ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১০ সাল অবধি। তবে এক নাগাড়ে বেশি দিন এ অঞ্চলে অবস্থান করেননি, এ সময়কার কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে যে প্রাণোল্লাস ও ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়, অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে তা অনেক বেশি। তাঁর কবি প্রতিভার উৎকৃষ্টতম ফসল সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি, কথা, কল্পনা, নৈবেদ্য, ক্ষণিকা ও কণিকা এ সময়ই তিনি রচনা করেন। বিখ্যাত কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, সালিনী রাজা, অচলায়তন, রম্যনাটক চিরকুমার সভা, অসংখ্য প্রবন্ধ এবং ছিন্ন পত্রাবলী এই কালপরিধির শ্রেষ্ঠ ফসল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বাংলা কথা সাহিত্যে ছোটগল্পের এই মহান স্রষ্টা তিনখণ্ড গল্পগুচ্ছের ৮৪টি গল্পের চুয়াল্লিশটিই রচনা করেন এ সময়। গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গান এবং গীতিমাল্য ও গীতবিতান এর বহুসংখ্যক সঙ্গীতের সূতিকাগার শিলাইদহ ও শাহজাদপুর। নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন যে গ্রন্থের জন্য সেই

গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ- Song Offering-এর বহু সংগীত লিখেছেন পদ্মার বোটে বসে। চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাহিরে ও চতুরঙ্গের মতো কালজয়ী উপন্যাসগুলোও তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র জীবন প্রবাহকে সামনে রেখেই।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য ও শিল্পভাণ্ডারের একটা বড় অংশ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য। এটি তাঁর জীবনের পরম পাওয়া বলে তিনি একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৪ সালে বাংলাদেশের নিসর্গ ও মানুষকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পগুচ্ছ এবং অমর কাব্য সোনারতরী প্রকাশের ৩৮ বছর পরও তিনি বাংলাদেশের পদ্মা-মধুমতি গোড়াই ধলেশ্বরী নদীকেন্দ্রিক প্রকৃতি ও মানুষকে ভুলে যান নি। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত পুনশ্চ কাব্যে তিনি লিখলেন-

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে
নিভৃতে, সবার হতে বহুদুরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মানুষ ও নিসর্গ ৩৮ বছর পরও একটি দূরাগত সঙ্গীতের মধুর ঝংকারের মতো তাঁর স্বপ্নকে করে তোলে বেদনা বিহ্বল-

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
-সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

বাউল গান ও বাউল প্রসঙ্গে শিলাইদহের একটি অন্যতম দিক। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে দেখা হোক বা না হোক, লালনের গান রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলো। বাউলগান রবীন্দ্রচিন্তা ও মননে যোগ করে অভিনব মাত্রা। লোকসাহিত্য এবং বাউলগান তখন ভদ্র ও সুশীল সমাজে ছিল ব্রাত্য ও অস্পৃশ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলাদেশের লোকসাহিত্য ও বাউলগানের নান্দনিক ও ভাবাত্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোকে জাতে তুলে আনেন। ১৯১৫ সালে তিনি লালনের কুড়িটি গান প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর পরই বাউল গানের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

শিলাইদহে গগন হরকরা, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল এবং আরো অনেক বাউলের সাথে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'-গানটি ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাব জগতের পরিচালিকা শক্তি। গোরা উপন্যাসে, জীবনস্মৃতি, শান্তিনিকেতন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় তিনি অচিন পাখি উপমাটি উপস্থাপন করেছেন।

শুধু নাই নয়, বাউল ভাব ও সুরের আদলে তিনি রচনা করেছেন অনেক গান। এ সম্পর্কে তার

নিজের স্বীকারোক্তি আমার অনেক গান বাউলের ধাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি, সে গুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র বাউলের রচনা।

কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়-

১। লালন ঃ আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে/ আমি জনম ভর একদিনও দেখলাম নারে
রবীন্দ্রনাথ ঃ আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইন

২। লালন ঃ ও যার আপন খবর আপনার হয় না/ আপনারে আপনি চিনতে পারলে/
যাবে সেই অচেনারে চেনা।
রবীন্দ্রনাথ ঃ আপনাকে এইজানা আমার ফুরাবেনা/ এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

৩। লালন ঃ কারে বলবো আমার মনের বেদনা/ এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলেনা
রবীন্দ্রনাথ ঃ আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ।

বাউল গগণ হরকরার বিখ্যাত সঙ্গীত- 'আমি কোথায় পাব তারে, মনের মানুষ যেরে'- গানের সুরের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটির সুরারোপ করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব লক্ষ্য করে অনেক অশিক্ষিত বাউল দাবি করে বসেন, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ জোড়া নাম কিনিয়াছেন।

বাংলাদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে করেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রেষ্ঠ ভাবুক। কিন্তু তিনি কি দিয়েছেন বাংলাদেশকে? প্রশ্নতো হতেই পারে। এর উত্তর- দিয়েছেন অনেক কিছু।
জমিদারি করতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু জমিদার-লাঠিয়ালের দাপট ছিলনা এতটুকু। প্রজাদের কল্যাণ চিন্তা থেকে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৭ সালের এক চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'পল্লীবাসীদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে গ্রামের যুবকদের দিয়েই তিনি এসব করার পরিকল্পনা করেছিলেন। যার সঙ্গে বর্তমান কালের বিভিন্ন এনজিওদের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য আছে। Micorciedit বা ক্ষুদ্রঋণ প্রথা এখন নতুন আবিষ্কার বলে দাবি করা হয়। কিন্তু আজ থেকে এক শত বছর পূর্বেই তিনি শিলাইদহে এবং পতিসরে সমবায় ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পতিসরে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার পুরোটাই শুভাকাঙ্খীদের আপত্তি সত্ত্বেও পতিসরের কৃষি ব্যাংকে জমা দিয়েছিলেন, কেবল কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের কথা ভেবে। তিনি বুঝেছিলেন কৃষির উন্নতি ছাড়া এদেশের পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। তিনি তাঁর বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে কৃষি শিক্ষার জন্য নিজ খরচে আমেরিকায় পাঠান। তারা দেশে ফিরে এসে শিলাইদহ এবং পতিসারে যন্ত্রনির্ভর আধুনিক কৃষি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ (কৃষিক্ষেত্রে) বিপ্লব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি কুষ্টিয়া শহরে Tagore & Company নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে পাটের গোডাউন ও রপ্তানির ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি উন্নতমানের গ্যান্ডারী আখ চাষ, আখমাড়াই কল এবং রেশন চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভাতের উপর চাপ কামানো জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ব্যাপক আলু চাষ শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বহুবার শিলাইদহে এসে কৃষি কাজে রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন। রবীন্দ্রনাথের এই সব উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিদেশি প্রভূদের পদানত করা। স্বদেশি আন্দোলনে

তাঁর যে সমর্থন, এসব উদ্যোগ তারই অংশ বিশেষ।

পল্লী উন্নয়নে তিনি জমিদারের স্বার্থ দেখেননি, বড় করে দেখেছেন প্রজাদের কল্যাণকে। কিন্তু এতসব করে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তা ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়ে তাঁর এইসব কর্মকাণ্ড সরিয়ে নিয়ে যান শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে।

অতএব চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ এবং বাঙালি অর্থাৎ আমরা কোন অবস্থানে রয়েছি? আমরা জানি, ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে, আমাদের জাতীয়তা বোধের যে চেতনার উন্মেষ ঘটে, ৬১ তে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে গিয়ে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর বাধা দানের ফলে বাঙালির সুপ্ত চেতনা জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। আমরা নতুন করে উপলব্ধি করি, রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন আমাদের অন্তরের নিভৃতে। তিনি চাদরের মতো জড়িয়ে রয়েছেন আমদের সমস্ত অস্তিত্বে। তিনি আমাদের হতাশার মুহূর্তে আলোর পরশ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মমর্যাদা বোধের, আমাদের পরিশ্রুত চিন্তা ও সৌন্দর্য ধ্যানের অনন্ত উৎস। আমাদের সংগ্রামে ও আনন্দে আমাদের বেদনায় ও সংকটে আমরা প্রাণ ভরে কামনা করি রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য। শুধু সার্ধশত বছর কেন, সহস্র বছরও আমরা তাঁর অমল, ধবল স্পর্শ ও প্রেরণাকে গ্রহণ করে যাবো জীবনের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে। তিনিই তো আমাদের ধ্রুপ। আমাদের আলোক। আমাদের আপন জন।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

Be RICH

"আপনি কি জমাকৃত পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী?
আপনার সঞ্চয় নিজেই স্বাধীনভাবে বিনিয়োগ করুন।"

আমাদের সেবাসমূহ

* BO Account খোলা হয় ও শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
* আমরা Full Depository Participant (DP)।
* অনলাইনের মাধ্যমে বিও (BO) একাউন্ট খোলা যায় এবং মনিটরিং করা যায়।
* ইন্টারনেট এর মাধ্যমে যে কোন অবস্থানে বসে নিজেই নিজের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা যায়।
* প্রাইমারী শেয়ার (IPO) আবেদন এর ক্ষেত্রে ফরম পূরণ থেকে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া, allotment and refund সংগ্রহ করা এবং refund ব্যাংকে জমা দেওয়া পর্যন্ত আমরা নিজেরাই করে থাকি।
* আমরা Investor এর শেয়ার মনিটরিং ও Portfolio Service দিয়ে থাকি।

এক দিনে BO একাউন্ট খোলা যায়

যোগাযোগের ঠিকানা

Be Rich Limited
(Rangpur Investor Care)
চিত্রকলা ভবন, ২য় তলা, কাচারী বাজার, রংপুর। মোবাইল ঃ ০১৭৩০০৪২৫১

প্রবন্ধ

কী সুন্দর অন্ধ

সোহরাব দুলাল

কী সুন্দর অন্ধ 'তুমি'র বৃত্তে বন্দি হয়ে আছে বাংলার কবিকুল। হাজারো দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে এমন পঙ্‌ক্তির। সঙ্গত প্রশ্ন তাই চল্লিশ শতাব্দী ধরে বাঙালি কবিদের যে তুমি'কে নিয়ে এতো মাতামাতি সে এখন কোথায়? কোন ঠিকানায়?

ভিন্নমত থাকতেই পারে! থাকেও। কেননা কবি ও সন্ন্যাসী এক নয়। তাদেরও সংসার আছে। আছে স্বপ্ন, সত্য-সুন্দরের সাধনা। কিন্তু শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালে কী আর সংসার বাঁচে? ঘরে কড়ি আনতে হয়। তারচেয়ে বড় কথা ঘরে যে কবিতা থাকে তারও চাই শক্ত শরীর। আর তা না পেলে তুমি'রা খুঁজে নেয় অন্যঘর, অন্যবর। কিন্তু যে ঘরে থাকে, তাকে যদি কবি আয়নার মতো ভেঙে দিতে চান তখন সে দেখায় তার নগ্ন শরীর। সে শরীর ছুঁয়ে কবি শান্তি পাননা। বুক জ্বলে যায়; শুধু বুক জ্বলে যায়। অভিজ্ঞ কবি সুনীলের। জানিনা, শেষ পর্যন্ত মিথ্যা অঙ্গীকার বেঁচে থাকে কিনা। হয়তোবা থাকে। তা না হলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এখন দৃঢ়তায় বলবেন কেনো-

'সে ভোলে ভুলুক
কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিবনা তোমায়।'

থামেনা বির্তক। প্রেমেন্দ্র মিত্র'র কণ্ঠে শুনি তাই ভিন্ন মত ভিন্ন স্বর-

'ভুলিব না' এত বড় স্পর্ধিত শপথে
জীবন করেনা ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাকে'।

কবিতার হাত ধরে যতোদূর হেঁটেছি তার যেটুকু প্রাপ্তি তাতো ঐ রবীন্দ্রনাথের অবিনাশী বচনে। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।' প্রকৃত অর্থে 'নানা পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে যুক্তি তর্কের জোরে একমাত্র পথ বেছে নেয়া বড় কঠিন'। অমিয় চক্রবর্তীর যুক্তিনিষ্ঠ এ অভিমত কোনো মতেই ফেলে দেয়া যায়না। 'নকসী কাঁথার মাঠ' এর কবি জসীম উদ্দীন এর 'তুমি' অনুরাগের চমৎকার এক দৃষ্টান্ত: 'তুমি আমাকে তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখতে বারণ করেছ, সে কথা না হয় আমি শুনলাম, কিন্তু কবিতা থেকে তোমার মুক্তি নেই। সন্ধ্যা তোমার সন্ধ্যামালতি অধরে, কবিতা লিখবে। যখন মেঘডম্বরু শাড়ি পরে বেরোবে তখন আকাশের কালো মেঘ তোমাকে অনুসরণ করবে। রাতে যখন শিয়রে এলোচুল ছড়িয়ে ঘুমোবে তখন চাঁদ তার জ্যোৎস্নায় জড়িয়ে নেবে তোমাকে।'

কথাটা অসত্য নয়। কখনো কখনো কবিই কবির বিরুদ্ধে দাঁড়ান। 'মিথ্যার একশেষ' বলেন কবিতাকে। পাল্টা যুক্তি হাসান হাফিজুর রহমান এর কবিতা চেতন্যেরই এক প্রকার সৌন্দার্যমণ্ডিত অভিলাষী সুরেলা বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবতার অস্থি নিয়ে তার কারবার নয়। বাস্তবতার নির্যাস, প্রাণ নিয়ে তার অপরূপ অস্থির ব্যঞ্জনাময় চঞ্চলতা।

অনস্বীকার্য– নারী, প্রেম, নিসর্গ, স্বদেশ কবিতার চির উপাদান। বুঝি তাই- 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' বলে সমরসেন বিষাদ ছড়ালেও ফুলফোটা বন্ধ থাকে না। অবক্ষয়, নেতি, নাস্তির কালেও বসন্ত আসে। ফুল ফোটে। অসে বর্ষা। 'প্রেমের প্রথম কদম ফুল' এর গান শুনি মুগ্ধ মনে। আর যে 'তুমি'কে নিয়ে এতো কথা, সে যদি না থাকে, না থাক। তাই বলে কী বৃষ্টিও থাকবে না? মোহাম্মদ সাদিক'-এর অনিন্দ্য অনুভব-

'তুমি না থাকলেও বৃষ্টি থাকবে
এখনো স্রোতের কাছে গিয়ে
এখনো ঝিলের কাছে গিয়ে
দুঃসময় ধুয়ে আসা যায়।'

অভিজ্ঞতার চেয়ে অনুপ্রেরণাই কবিতা লেখার বড় উৎস। অকুণ্ঠ আবুল হোসেন এ বিশ্বাসে, 'অভিজ্ঞতা যতো বেড়েছে বুঝেছি কবিতা লেখার জন্য- অনুপ্রেরণাই মুখ্য। অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া যায় বাংলা কবিতা থেকে–

১। 'সমস্ত কর্মের মূলে মহীয়সী তুমিই উত্তেজনা
তুমি নেই, কিছু নেই, নেই তবে ঈশ্বর বন্দনা।' -(অচিন্ত কুমার সেন গুপ্ত)

২। 'তোমার মোহনরূপে কে থাকতে পারে ভুলে
যে থাকে সে আত্ম-প্রবঞ্চক।' - (আল মাহমুদ)

৩। 'তুমি ভালো না বাসলেই বুঝতে পারি
ভালোবাসা আছে এখনো পৃথিবীতে।' - (শামসুর রাহমান)

৪। 'এখন জেনেছি জীবনের তুমিই অনন্ত উৎস
তাই সবকিছু ছেড়ে ধ্যানজ্ঞান করেছি তোমাকে।' -(মহাদেব সাহা)

৫। 'যেখানেই রাখি হাত
সেখানেই তোমার শরীর।
বৃক্ষের বিভূতি থেকে রুদ্ধশ্বাস জলধি অবধি
তোমাকেই দেখি অহর্নিস।' -(নুরুল হুদা)

৬। 'তোমারে ঠেলিয়া তোমারে খুঁজেছি'-(যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত)

বস্তুত, এই 'তুমি' বোধের বিষয়টিকে আরো স্বচ্ছ করা যেতে পারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর কথায়, যেমন– পাখিকে তার গান থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ফুলকে তার সৌরভ থেকে, তেমনি কবিতা থেকে তুমিকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ কাজ নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তুমি কী তবে অটল আস্থার ইমারত? নিষ্ঠার প্রস্তর মূর্তি, স্থবির, নিস্প্রাণ? এই দোলাচলে তর্কটা জমে ওঠে দারুন। যে সুধীন বলছেন, কোটি মন্বন্তরে ভুলবেন না- তিনিই বলছেন, 'অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ।' এই যুদ্ধে কে যে হারলেন আর কে হলেন জয়ী- কার সাধ্য বলবে তা?

এই তর্কে স্মরণযোগ্য হতে পারেন বুদ্ধদেব বসু-'আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল শনাক্ত করা যাবে।' যদি সুনীলকে এনে দাঁড় করানো হয় এই বিতর্ক মঞ্চে– তবে তিনি এমন বাক্যে দ্বিধান্বিত হবেন না মোটেই–

'শুধু কবিতার শব্দ নির্মাণের জন্য নারী
এ অন্যায় কবিকেও মৃত্যুতেও অতৃপ্ত রেখে দেয়'

মনে পড়ে যায় দু'দন্ডের শান্তির জন্যে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়ানো জীবনানন্দকে। সে শান্তি এখন কোথায়? নির্মলেন্দু গুণ অথবা সুনীলের নীড় আজ কোন কথা বলে?-

'আমি তাকে যদি
আয়নার মতো
ভেঙ্গে দিতে যাই
সে দেখায় তার নগ্ন শরীর
সে শরীর ছুঁয়ে শান্তি হয় না, বুক জ্বলে যায়
বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়।

আধুনিক যুগ এবং জীবনের যন্ত্রণা গভীর বোধে উপলব্ধি করেছেন জীবনানন্দ দাশ। জীবনের টুকরো টুকরো মৃত্যু এবং সাধের ব্যর্থতা তাকে দিয়েছে ভিন্ন ভাষা। ভিন্ন চেতনা। খণ্ডিতের মাঝেই এখণ্ডকে অনুভব করেছেন তিনি। 'অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতা নয়।' এই যে উপলব্ধির সীমা ছাড়িয়ে যাবার সাধ- এবং তা না পাবার ব্যর্থতা, এমন চিত্রশিল্পেই প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক যুগ ও জীবনের যন্ত্রণা-

'জানি- তবু জানি
নারীর হৃদয় -প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়-
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে
ক্লান্ত ক্লান্ত করে'।
'স্বপ্ন আমার কবিতা
অমাবস্যার দেয়ালি
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘ রজনীর সবিতা।'

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি চারটির কবি বিষ্ণুদে। যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শুধু পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণের উপলক্ষ কবি বলেছেন। বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নে 'ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবি জীবনের পরম সার্থকতা- এ মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল এখন পর্যন্ত বাংলার সবচেয়ে সার্থক কবি।'

না শুধু তুমি'ই সব আনন্দবেদনার উৎস নয়। অমরত্ব নয়, একমাত্র তোমার গহনে।

লেখক: সাহিত্যিক ও লেখক

new
computer museum

sales, service, software solution...

01713 272 038, 0521-65213
computermuseum2u@gmail.com

1st floor, rojonigandha hotel, jahaj co. more, rangpur-5400

MENTORS

বিদেশে ভর্তি
Bridge College In Sweden only 6.5 lakh Taka

MBBS in China
Cheaper than Private Medical

BBA MBA
ACCA
Hotel Management
In USA UK

Work Permit & Study in Malaysia

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:
01977524088

IELTS
কোর্স এবং রেজিস্ট্রেশন*
SPOKEN

The following books are available for selling.....
BBA PU With most recent Questions
MBA Admission Guide for IBA
Published By MENTORS

RABS ADROIT
Fundamentals of Business
সরোবর জ্ঞান সিন্ধু
Published By Paragon

এই বিজ্ঞাপনটি দেখালে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ছাড়ের উপর ১০% ছাড় পাবেন।

Senpara, Rangpur. Call: 01717524088

DF Foods

Tel: 66888
Mob: 01724 82 60 15

DHAKA FAST FOODS

- Always Fresh.
- Here is a wonderful surprise for you.
- Good Taste Never felt so good.
- Your kind visit is apreciated.

DHAP, JAIL ROAD, RANGPUR.

01715-949952
01714-230343

Earth Computers Ltd.

1 stop IT Solution

1st Floor, Nur Super Market
Zahaj Company More
Rangpur. Phone: 0521-61398

প্রবন্ধ

তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

সাদিয়া আরেফিন ঝিনুক

সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয় তথ্যপ্রযুক্তি। যার ফলে গোটা বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয় অর্থাৎ একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সুফল পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে আমাদের জানতে হবে তথ্য প্রযুক্তি কি? তথ্য প্রযুক্তি হলো তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা ও বিতরণের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সমন্বয়। ডাটাবেস উন্নয়ন, প্রযুক্তি, মুদ্রণ ও রিপ্রোগ্রাফিক প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রযুক্তি ইত্যাদি নেটওয়ার্ক তথ্য প্রযুক্তির কিছু উল্লেখযোগ্য দিক। এবং কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন ও মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স এই তথ্য-প্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তথ্য প্রযুক্তির কারণে গত দুই যুগ ধরে বিশ্বে ঘটছে অকল্পনীয় সব পরিবর্তন। কোনো দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে তথ্য প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। তরুণ প্রজন্ম এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিএস, ইপিবি, বিসিসি, নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি সংগঠন টেকবাংলা প্রভৃতি সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তথ্য প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ গত দশ বছরে অনেকখানি এগিয়েছে। বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল, তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে কম্পিউটার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা অনুমোদন করেছে। এ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে কাওরান বাজারে ৭০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ফ্লোরে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করেছে। তবে এ কথাও সত্য যে তথ্য প্রযুক্তির উপরকণ তৈরি ও প্রসারে আমাদের কোনো অগ্রগতি নেই। তাছাড়া এ বিষয়ে পরিপূর্ণ গবেষণা ও আরো বেশি জ্ঞান আহরণের জন্য যতখানি সুযোগ, সুবিধা, উপরকণ ও যে রকম পবিবেশ দরকার আমরা তা পাচ্ছি না। যার ফলে তথ্য প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া আমাদের মতো দেশগুলোর সাথে উন্নত দেশগুলোর আইসিটি সেক্টরে এক ধরনের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। যাকে বলে "Digital Divide"। তাই একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কতদিন আমরা যোগ্যতার সাথে টিকে থাকতে পারবো তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর এজন্য দেশের তরুণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ আজ সময়ের দাবি। প্রযুক্তি ভিত্তিক লেখাপড়া, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ প্রযুক্তি চালুকরণ, প্রযুক্তি গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা, জাতীয় তথ্য অবকাঠামো গঠন, গ্রামভিত্তিক লাগসই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি। যা তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়ে উপহার দেবে একটি স্বপ্নের সোনার বাংলা।

লেখক: শিক্ষার্থী, মার্কেটিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

প্রবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনীতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

শাহজাহান আলী

দেশের চলমান অর্থনীতি আর সংশ্লিষ্ট নীতি-রাজনীতি নিয়ে আমরা অনেকটাই চিন্তিত এবং শঙ্কিত। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের উদ্বেগের অন্যতম কারণ অর্থনীতি চলার বর্তমান ধারাপাত। স্বাধীনতার ৪১ বছর পার হলেও আমরা 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি' শব্দ দুটোর লাগাম ধরতে পারিনি। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জার্নাল অনুযায়ী, বাংলাদেশের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের যে বৈদেশিক অনুদান তার সিংহ ভাগ যায় রাঘব-বোয়ালদের ব্যাংক একাউন্টে। অন্য একটি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী বছরে প্রায় ৭০,০০০ কোটি কালো টাকার সৃষ্টি হয়, মানি লন্ডারিং হচ্ছে বছরে প্রায় ৩৪,০০০ কোটি টাকা। ৩০,০০০ কোটি টাকার ঋণ-খেলাপি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, শুটি কয়েক ব্যক্তি বছরে প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকার ঘুষ খাচ্ছেন। আর ক্রমবর্ধমান ধন-বৈষম্যের কথা তো সরকারিভাবেই স্বীকৃত। বাংলাদেশের ৫% ধনী লোক দেশের মোট পারিবারিক আয়ের ৩০% দখল করে আছে। যদি কালো টাকা যোগ করা হয় তবে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশে। এ রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের শর্তাদি বিনষ্ট করছে।

অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি সমাজের সকল স্তরে দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে দিতে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া যেন বঞ্চিতদের আরো বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের হিসাবের এই উপাত্ত এটাই প্রমাণ করে যে, এক সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন সংস্কৃতি আমাদের পেয়ে বসেছে। এটা মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নের সহায়ক, সার্বিক পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সুযোগ সমূহ ক্রমাগত সীমিত হচ্ছে। প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যার ভিড়ে বাংলাদেশের দ্বৈত-অর্থনীতিতে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ১০ লক্ষ লোক অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করেছে, অপর দিকে অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতাহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ৯০ লাখ। এরা বহিঃস্থ, বঞ্চিত এবং নিঃস্ব।

রাজনীতিবিদরাই এই সমাজে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের উদ্দেশ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কিছু কথা বলেন, "এ দেশে দরিদ্রদের স্বার্থ নিয়ে লাগাতার ভাবে কথা বলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আপনারা মানব দারিদ্র ও মানব বঞ্চনার বিরুদ্ধে নির্মোহ সত্য কথা বলুন... সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি কৌশল পরিবর্তনে সোচ্চার হউন... মনে রাখবেন অন্ধত্ব পরিহার না করলে খুব বেশি আগানো যাবে না।

দেশের সত্যিকার উন্নতি নিশ্চিত করতে সমঅর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রয়োজন। এসব নিশ্চিত করতে পারি দুর্বৃত্তায়ন ও বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন করে। দুর্বৃত্ত ও দারিদ্র এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। সমস্যার সমাধানে জন-কল্যাণকামী, রাজনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। দেশের সুনাগরিক হিসেবে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদা আর রাষ্ট্র যা সরবরাহ করেছে- এ দু'য়ের পার্থক্য নিরুপণ করতে পারি; পার্থক্যের কারণসমূহ উদ্‌ঘাটন করতে পারি; পার্থক্য হ্রাসে যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাবনা পেশ করতে পারি। সেক্ষেত্রে সংকীর্ণ অর্থশাস্ত্রকে বৃহৎ গন্ডির রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের অনুগত শাস্ত্র হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের বাইরে আসতে হবে। সময় সেটিই দাবি করে।

লেখক: শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

গল্প

তারা

সীমান্ত অসীম

"তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা... ।"

-তারা, ধলাভাই কিন্তু গানে গানে তোর কথাই বলল।

-ধুর, গান তো গানই। এসব নিয়ে কথা বলবিনা।

ধলামিয়া শিকদারবাড়ির বারোমাসী ভৃত্য। শিকদারদের জমিতে শস্য রোপণ, পরিচর্যা ও ঘরে তোলার সবকাজ দেখাশুনা করে। প্রতিদিন সকালে গরু ছাগলগুলো গোয়াল থেকে বের করে মাঠে নেওয়া, পুকুরে বা নদীতে নিয়ে গোসল করানো, সন্ধ্যায় গোয়ালে তোলা, নিত্যদিনের বাজার, প্রয়োজনে মেয়ে-ছেলেদের জামা কাপড় দুরের গাঁয়ের হাট থেকে লন্ড্রি করে এনে দেওয়াসহ বাড়ির ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-বউ সবার মন রক্ষা করে চলা তার একমাত্র কাজ। শুধু কাজ বললে ভুল হবে, এগুলো সে করে মনের আনন্দে। সব কিছু আপন করে নিতে সে সদা ব্যস্ত। ধলামিয়ার মা-বাবার কথা আজ আমাদের কারো মনে নেই। তবে শুনেছি বড় গেরস্থ ছিলেন ধলামিয়ার বাপ-দাদারা। গ্রাম্য কোন্দল আর ভিলেজ পলিটিক্সের ম্যারপ্যাচে সর্বশান্ত হয়ে অনাথ চারটি সন্তান রেখে অকালে মারা যান ধলামিয়ার মা-বাবা। ধলামিয়া, দুই ভাই ও এক বোন আশ্রয় নেয় খালার বাড়িতে। খালা ছিলেন নিঃসন্তান। তাই খুব সহজেই ওদের চার ভাই-বোনকে নিজেদের সন্তান মনে করে একত্রে বসবাস করতেন। নিজেদের শেষ সম্বল ভিটেমাটিটুকু লিখে দেন ওদের নামে। সামান্য আয় দিয়ে কোন মতে দু'বেলা খেতে পারলেও লেখাপড়া করানোর মত অবস্থা ছিলনা। ধলামিয়ারা কেউই প্রাইমারির গণ্ডি পার হতে পারেনি বরং খুব ছোট বেলা থেকেই ওরা তিনভাই নেমে পড়ে হাড়ভাঙা খাঁটুনিতে। অন্যের ক্ষেতে শ্রম বিক্রি, মাটি কাটা, ছোট খাটো ব্যবসার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে ওদের বেঁচে থাকার এক অদম্য দুঃসাহসী লড়াই। এতিম অনাথ কিশোর ধলামিয়া। লেখাপড়া জানা নেই। তাতে কি সৃষ্টিকর্তা ওদের তিন ভাইকেই সযত্নে তৈরি করেছে। মোহনীয় ব্যক্তিত্ব, সুরেলা কণ্ঠ আর অফুরন্ত হাসি খুশিতে ভরা প্রাণবন্ত তিনটি নক্ষত্র। ধলামিয়া যখন নদীর ধারে বা খোলা আকাশে নিচে বসে তার সুরেলা কণ্ঠে দু-চারখানি ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি বা আধুনিক গান ধরে তখন পাড়ার সব তরুণের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যাদের সুযোগ আছে তারা তখনই ধলামিয়ার চারদিক ঘিরে বসে যায়। আর ধলামিয়া তার আপন সুরে একের পর এক গান গেয়ে যায় অবলীলায়। সংস্কৃতির প্রতি ধলামিয়ার অদম্য টানের কারণে গ্রামে গড়ে ওঠে একটি যাত্রা পালার দল। সৎমা, বেহুলা-লখিন্দার, কমলার বনবাস, এক পয়সার আলতাসহ নানান পালা মঞ্চস্থ হতে থাকে দিনের পর দিন। সবগুলো পালাতেই ধলামিয়া কেন্দ্রিয় চরিত্রে। সে শিকদার বাড়িতে থাকে। যাত্রাপালায় যোগ দেয়, পালা শেষে আবার ফিরে আসে। শিকদার বাড়ির থেকে খালার বাড়ির দূরত্ব নেই বললেই চলে। বাগানের মধ্য দিয়ে সরু পথে পাঁচ সাত মিনিট হাঁটলেই আসা যায়। তাই রোজ না পারলেও এক/দুইদিন বাদে এসে সে খালা-খালুদের দেখে যায়। মাঝে মাঝে শিকদার বাড়ির ফলমূল এবং শাক-সবজি নিয়ে আসে।

শিকদার বাড়ির পূর্বে মুন্সী আর পশ্চিমে মোল্যাদের বসবাস। মুন্সী, শিকদার এবং মোল্যারা গ্রামের অভিজাত শ্রেণীর একাংশ। এদের ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও গ্রামে বেশ রক্ষণশীল। মেয়েরা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থাকে। গ্রামের এসে কখনো কোন অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলেছে কিনা বা কোনদিন কোন গান/নাটক/যাত্রাপালা/ঘোড়দৌড়ের মেলাতে গিয়েছে কিনা তা বলা মুশকিল। কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা আর শাসনের বেড়াজালে তাদের মনের ইচ্ছাগুলো মনের মধ্যেই হারিয়ে ফেলতে হয়। তারা লোকমুখে শুনে তাদের প্রিয় ধলাভাই যাত্রাপালায় মহানায়ক।

ধলামিয়া যখন কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুনিয়ে গান করে মাঝে মাঝে কেউ কেউ হয়তো শুনে থাকবে। সেদিন পূর্ণিমার রাত। গ্রীষ্মের ছুটিতে ওদের ছেলে-মেয়েরা বেড়াতে এসেছে। তীব্র গরমে কারো ঘুম আসছেনা। একে অপরকে ডেকে তোলা, উঠোনে বসে গল্প গুজব, রাস্তায় ঘোরাঘুরি। সব মিলিয়ে ১৫/১৮ জনের এক জমজমাট আড্ডা। হঠাৎ মোন্যার বড় মেয়ে নুরুন্নাহার বলল, চল সবাই গিয়ে ধলাভাইয়ের গান শুনি। যে কথা সেই কাজ। ধলামিয়া তখন গভীর ঘুমে শিকদারের দক্ষিণ ঘরের এক কোণায়।

"ধলাভাই, ও ধলাভাই, ওঠো না"।

ধলামিয়ার কোন সাড়া নেই। নাকের বাঁশির সুরে সুরে ঘুমাচ্ছে। তার কপালের ঘাম পুরুষকণ্ঠী বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বুকের ঘন কালো পশমের মধ্যে জমে থাকা ঘামবিন্দু পূর্ণিমার আবছায়া আলোয় চিকচিক করছে। ওদের মধ্যে একজন ধলামিয়ার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙালো। ধলামিয়া বিছানায় উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। ওদের দুরন্তপনা, খিলখিল করে হেসে ওঠা, ধলাভাই বলে মিষ্টি সুরে ডাকা ডাকিতে ধলামিয়া কিছু সময়ের জন্য নিথর হয়ে বসে রইল।

- ঘুম ভাঙালে কেন?

-আমরা তোমার গান শুনব।

-এত রাতে গান গাওয়া সম্ভব না।

-আমাদের ঘুম আসছে না। সবাই এক সাথে হয়েছি তোমার গান শুনব বলে। লোকের মুখে তোমার গানের কথা শুনি। আজ আমাদের শোনাতেই হবে।

-চাচাজান রাগ করবেন।

-তা আমরা দেখব। তুমি গান না গাইলে আমরা যাব না।

-কি গান শুনবে। আমি কিন্তু একটার বেশি গাইব না।

-তোমার ইচ্ছে।

ধলামিয়া গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করলো। একে একে ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি। দেখতে দেখতে আসর বড় হতে থাকলো। বাড়ির বউরা এসে যোগ দিল। আজ গান গাইতে ধলামিয়ার কেন জানি অন্যরকমের আনন্দ লাগছে। বড় আসরে হাজার মানুষের হাততালি পায়, তবুও এত ভালো লাগেনি কখনো। এবার একটি আধুনিক গান ধরল।

"তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা...।

"জাফর এতরাতে কিসের গান।

চাচাজানের দানবীয় চিৎকার। সবাই বারান্দা ছেড়ে সে যার মত সরে পড়ল। শুধু চাচীজান বসে রইল। ওর পক্ষ নিয়ে বলল, ধলামিয়ার কী দোষ। ওরাইতো জোর করে ওকে দিয়ে গান করালো। চাচাজান আর কিছু না বলে চলে গেলেন। ধলা, তুমি ঘুমাও। চাচীজান চলে গেলেন। ধলামিয়া নামটা চাচীজানেরই দেওয়া। মা-বাবা ওর নাম রেখেছিল জাফর। কিন্তু শিকদার বাড়িতে কাজ করতে এসে ওর নামটা পাল্টে ধলামিয়া নামে ডাকা হয়। শিকদারের বড় ছেলে ও ভৃত্যের নাম এক হওয়াতে সবাই বেশ বিব্রত হত। তাই চাচীজান সবাইকে বলে দিয়েছে ওকে ধলামিয়া নামে ডাকতে।

প্রায় এক বছর কেটে গেছে। তারা কোনদিনই ধলামিয়ার সাথে কথা বলেনি। ওদের মেয়েরা আধুনিক, স্মার্ট, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। ভাবগাম্ভীর্য্য ও আত্ম-সম্মান বোধ প্রবল। তারা আরো বেশি ব্যতিক্রম। প্রয়োজনের বাইরে মা-বাবার সাথেও একটি বাড়তি কথা কখনো বলেনা। স্বভাবতই ধলামিয়ার সাথেও কোনদিন তার কোন কথা হয়নি। বোনেরা আর কোনদিন ঐ গান নিয়ে তাকে খোটা মেরেছে কিনা সেটাও ধলামিয়া জানেনা। সামনের বৃহস্পতিবার থেকেই তারার ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু। দক্ষিণের ঘরে বসে তারা তার পড়া মুখস্থ করছে। চাচীজান পশ্চিমের ঘরে দুপুরে রান্না করেছে। ধলামিয়া মাঠ থেকে ফিরে শিকদারের ছোটছেলের এক বছর বয়সী একমাত্র মেয়েকে কোলে নিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে বাচ্চাটার সাথে কথা বলছে, আম্মু আমি কি অপরাধ করেছি যে তোমার ছোট ফুপি আমার সাথে এই এক বছরের মধ্যে একটা কথা বলেনি। তারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আরো কিছু কথা বলে চলছে আপন মনে। চাচীজান রান্না ঘর থেকে বের হয়ে বলল, ধলামিয়া, তোমাদের গ্রামেতো কাল ঘোড়দৌড়, মেলা থেকে আমাদের জন্য অনেক মিষ্টি কিনে আনবে।

-জি চাচীজান।

পরের দিন বিকালে ধলামিয়া অনেক স্বাদের নানান পদের মিষ্টি এনে চাচীজানের হাতে দিল। গত রাতে চাচীজান বেশ কিছু পয়সা-কড়ি তাকে দিয়েছে। বাড়ির সুপারি, নারকেল, আম, জাম, কাঠাল, লিচুসহ বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল ও গাছগাছালি বিক্রির টাকাগুলো চাচীজান একটা হাড়ির মধ্যে রাখেন। যাকে খুশি তাকে বিলিয়ে দেন। আম্মু, তোমার ধলাকাকুকে বলো, মেলা থেকে সে যে মিষ্টি এনেছে সেখান থেকে আমি একটা মিষ্টি খেয়েছি। তোমার কাকু কি আমাকে একটা কাজ করে দিতে পারবে। মেলার পরের দিন দুপুরে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তারা ধলামিয়াকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলল। ধলামিয়া এগিয়ে গেল। বলল, ছোট আপু তোমার কি কাজ করে দিতে হবে।

- আগামী শনিবার আমি পরীক্ষা দিতে শহরে যাব। মাইজপাড়ার হাট থেকে আমার কাপড়গুলো লন্ড্রি এবং কিছু বাতাসা ও দানাদার কিনে এনে দিতে পারবেন?

- অবশ্যই, ছোট আপু তুমি রেডি কর। আমি গোসল করে হাটে যাব।

ধলামিয়া অন্যরকমের শিহরণে কয়েকবার কেঁপে উঠল। এই প্রথম তারা তার সাথে সরাসরি কথা বলেছে। দ্রুত পুকুর ঘাটে গেল। ভালো করে সাবান দিয়ে গোসল করে বাড়িতে গেল। অশান্ত চঞ্চল মনের উৎফুল্লতায় সে এ ঘর ও ঘর ছুঁটোছুঁটি করছে। শিকদার বাড়ির সবার বিশ্বস্ত সে। তার কোন ঘরে যেতে বাধা নেই। ধলামিয়ার চুলের সৌন্দর্য্য এমনিতেই নজর কাড়া। তবুও সে আজ চুল আঁচড়িয়ে হাটে যেতে চায়। আয়না চিরুনি খোঁজ করে। বারান্দা পেরিয়ে উত্তরের ঘরে পা রাখতেই ঘটে গেল জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি। তারা সাধারণত দক্ষিণের ঘরেই থাকে। তবুও আজ দুপুরে কেন যেন উত্তরের ঘরে। ধলামিয়া ঘরে উঠছে, এক পা কেবল ঘরে প্রবেশ করিয়েছে। তারা তখন ঘর থেকে বের হচ্ছে। একে অন্যকে না ধরলে পড়ে যায়। নিয়তির খেলায় ওরা হেরে যেয়ে ছোট বড় পার্থক্য ভুলে একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। আলাদা হওয়ার আগে ধলামিয়া বলল, রাতে একবার আমার সাথে দেখা করবে। তারা বলল, আচ্ছা। দুপুরে খাবার খেয়ে সে সাইকেলে চড়ে দূরের গাঁয়ের হাটে চলল। সৃষ্টিকর্তা ধলামিয়াদের সারা জীবন অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করলেও সে আজ হাজার বার সৃষ্টিকর্তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্যাডেল চালিয়ে সন্ধ্যায় আবার শিকদার বাড়িতে ফিরে এল। বাড়িতে ঢুকেই সে অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেখতে পেল। সবাই

ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। শিকাদারের ছোট বেলা পাশের গায়ের হাইস্কুলের হেড মাস্টার। সবাই স্যারকে পা ছুঁয়ে সালাম করে দোয়া নিচ্ছে। একে একে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় দিতে বেশ খানেকটা রাত হয়ে গেল। এবার তারা বাড়ির সবার কাছ থেকে সালাম ও দোয়া নিচ্ছে। চাচীজান ধলামিয়াকে বলল, জাফর তারার জন্য দোয়া করো। ও যেন ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারে। তারার জন্য তো আমি সব সময়ই দোয়া করি, অস্পষ্ট স্বরে ধলামিয়া বলল। শিকদার বাড়িতে আজ বড় এটা ভুড়িভোজ হলো। ধলামিয়া হাট থেকে কয়েক প্রকার মাছ এবং মাংস কিনে এনেছে। চাচীজান অনেক প্রকারের খাবার নিজ হাতে রান্না করেছেন। তারার পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে এটাই সবচেয়ে বড় আয়োজন। খাওয়া দাওয়া, গল্প-গুজব শেষে যে যার ঘরে ঘুমাতে গেল। দক্ষিণ ঘরে দুইটা রুম। বড় রুমটায় তারা এবং চাচীজান থাকেন। অন্যটিতে ধলামিয়া মাঝে মাঝে থাকে। চাচাজান সাধারণত থাকেন ছোট ছেলের ঘরের বারান্দাতে। ধলামিয়া আজও দক্ষিণ ঘরের ছোট রুমটাতে ঘুমাতে গেল। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। পৃথিবী নিঝুম হয়ে আসেছে। ধলামিয়ার ঘুম আসেনা। বিছানার শুয়ে এ পাশ ও পাশ করতে থাকে। কেমন যে এক অস্থিরতা কাজ করে নিজের ভেতর। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে দরজায় খোলার শব্দ হল। ধলামিয়া বুঝতে পারে তারা ঘর থেকে বের হয়েছে। ধলামিয়াও বের হয়। আস্তে আস্তে সংগোপনে দু'জন এগিয়ে যায় পেয়ারা গাছের দিকে।

-তুমি পরীক্ষা ভালভাবে দেবে।
-আমার জন্য দোয়া করবেন।
-তুমি কি আবার ফিরে আসবে?
-অবশ্যই। বিশ্বাস রেখো।

তারা পরীক্ষা দিতে চলে গেল। দীর্ঘ প্রায় দেড়মাস পরে পরীক্ষা শেষ করে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এল। এই দেড় মাস বেশ দীর্ঘ মনের হয়েছে তার। প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে বেশ অস্থিরতায়। সমস্ত অস্থিত্ব দিয়ে অনুভব করেছে ধলামিয়াকে। বাড়িতে ফিরেই ধলামিয়ার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। অন্য দিকে ধলামিয়া নানা ভয় আর সংশয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু তারার জন্য তার অস্থিরতা কোনভাবেই গোপন করতে পারে না। তারা অনুভব করে সমস্ত আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছে। ইচ্ছা করলেই আর ফেরা সম্ভব নয়। তারা আরো বেশি উত্তাল হয়ে ওঠে। সবার ছোট তারাকে সবাই অতি আদর-স্নেহে রাখে। ছোট ভাই প্রতিরাতেই একই প্লেটে তারার সাথে খাবার খায়। তারা সব সময় তার খাবারে একটি অংশ রেখে দেয় ধলামিয়ার জন্য। দুধের সর, মাছের মাথা কিংবা মাংসের টুকরা সুযোগ পেলেই ধলামিয়াকে খুব আদর করে খাওয়ায়। ওরা অতি গোপনে চলতে থাকে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে পেয়ারা গাছের তলায় দুজনে দেখা করে। মাঝে মাঝে তারা দুপুর বা সন্ধ্যা বেলায় ধলামিয়াকে দেখার জন্য কলতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের মনের গোপন ভালোবাসা দেহের ভাষার ফুটে ওঠে। ওরা বেশ অস্থির হয়ে নিজেদের সীমানা পেরিয়ে যায়। কেমন করে যেন বাড়ি থেকে পাড়ায় ওদের প্রেমের খবর ছড়িয়ে পরে। মোল্ল্যা বাড়ির চাচী এবং দাদীমাদের কেউ কেউ ধলামিয়াকে শিকদার বাড়ির ছোট জামাই বলতে শুরু করে। কেউ কেউ তারাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে থাকে। তারার জিদ বেড়ে যায়, একদিন ধলামিয়াকে ডেকে বলল, চলো আজ রাতে আমরা পালিয়ে যাই।
-কোথায়
-রংপুর, টংপুর। তারার ভাবনা ছিল রংপুর বাংলাদেশের শেষ প্রান্ত ওখানে গেলে কেউ কোনদিন ওদের খুঁজে পাবেনা।

-টাকা পয়সা কোথায় পাব?
-চিন্তা করোনা। ছোট ভাইয়ের স্কুলের কাজ চলছে, অনেকগুলো টাকা গতকাল ব্যাংক থেকে তুলে আমার কাছে রেখেছে। তাছাড়া আমার অনেক গয়না আছে। তাতেই সারা জীবন চলে যাবে।

ধলামিয়া কোন কিছু না বলে তখনই খালার বাড়িতে চলে এল। অনেকক্ষণ খোঁজা খুঁজি করে আলম এবং আজগারকে পেল। আলম এবং আজগার পাড়ার শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে অন্যতম। দুই জনই বড় গেরস্তের ছেলে। কলেজে পড়ে ডিগ্রিতে। ধলামিয়া অশিক্ষিত হলেও আলম এবং আজগার তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আলম বেশ চঞ্চল ও দুষ্টু প্রকৃতির। নিজেদের কোন অভাব না থাকলেও পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলেদের নিয়ে মুন্সীদের মুরগী চুরে করে খাওয়া, বিভিন্ন ফল পেড়ে বিক্রি করা তার নেশা। দু-একটা মেয়ের সাথে ভাবের সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রচার করে। অন্যদিকে আজগার বেশ মিষ্ট ভাষী ও রসিক প্রকৃতির। সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাজনীতি সচেতন। ধলামিয়া সন্ধ্যার পরে তার অন্যতম কাছের এ দু'বন্ধুকে নিয়ে বসে তারার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। আলম বেশ উচ্ছ্বসিত।

-এত বড় সুযোগ তুই জীবনে আর কোনদিনই পাবিনা। অবশ্যই আজ রাতেই ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবি। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

-না, তা হয়না। জাফর তুই এ কাজ করিস না। অনেক ঝামেলা আছে।

-আজগার ভাই, তুমি সব সময়ই একটু বেশি ভাব। তোমার সাথে কোন ব্যাপারে কথা বলে লাভ নেই। জাফর, তুই আজগার ভাইয়ের সাথে থাক আমি নেই।

আলম রেগেমেগে ওখান থেকে চলে গেল। আজগার ধলামিয়াকে সামাজিক বৈষম্য, থানা-পুলিশ ইত্যাদি বুঝাতে থাকে। খালা-খালু, চাচা-চাচীর কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে আজগারও খান থেকে চলে গেল। ধলামিয়া আলোটের ঘাসে গা এলিয়ে দিয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে তারাগুলো গুণতে থাকে। একটি উজ্জ্বল তারায় দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। তারার মুখ খানি মনে পড়ে। তারাকে নিয়ে আকাশের ঐ তারার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার সাধ জাগে। মনে পড়ে নিঃসন্তান খালা খালুর মুখ। ধলামিয়া শিকদার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বাড়ির প্রবেশ দ্বারেই তারা দাঁড়িয়ে আছে। তারা এমনিতেই বেশ সুন্দরী। পাড়ার সব যুবকের কাছে সে ডানা কাটা পরি। আজ পূর্ণিমার রাতে তারাকে আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখের জলধারা কপোল গড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে, যেন বাধ ভাঙা জোয়ার। ধলামিয়া এগিয়ে যেতেই নিঃশব্দে কান্না শুর করল।

-এত দেরি করলে কেন! আমি রেডি। চল যাই।

-তোমাকে নিয়ে যদি পালিয়ে যাই আমার অনেক বিপদ হবে। তাছাড়া তুমি যদি পার আমার পক্ষে না থাক?

-দাঁড়াও, আমি কোরাআন শরীফ নিয়ে আসি। কোরাআন মাথায় দিয়ে দিব্যি দিব। আমি তোমার বিপক্ষে যাবনা।

-ঠিক আছে। কিন্তু চাচা-চাচীকে তো কষ্ট দিতে পারব না। আমাকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব না। তুমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।

মুহূর্তেই তারা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ধলামিয়াকে কাপুরুষ বলে গালি দিতে দিতে ক্ষিপ্র পায়ে গিয়ে ঘরের দরজা স্বশব্দে লাগিয়ে দিল। ধলামিয়া মাঠের দিকে পা বাড়াল। সেই রাতটা দু'জনের কেমন করে কাটলো তা কেবল তাদের সৃষ্টিকর্তাই জানেন। পরের দিন খুব ভোরে খালা-খালুকে সালাম

করে ধলামিয়া বেরিয়ে গেল।

-কোথায় যাচ্ছিস?

-চাকরি করতে।

সে কয়েক দিন আগেই শুনেছিল সদ্যস্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু বেকার যুবকদের আনসার, ভিডিপি, এবং পুলিশসহ নানা পদে চাকরি দিচ্ছেন। রাজ্জাক ভাই ওকে বলেছিল, জাফর তুই যদি চাস তবে আমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তখন ধলামিয়া কিছু বলে নি। কিন্তু আজ ওকে যেতেই হবে। অনেকটা জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো। তারার কোন খবর না নিয়েই ও নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়।

তারার পরীক্ষার ফল বের হয়। প্রথম ডিভিশনে পাস করেছে। সবাই মহাখুশি। তারা শুধু নিশ্চুপ। তবুও কারো চোখে তা ধরা পড়ে না। সবাই ভাবে ওতো এ রকমই, কোন কিছুতে বাড়তি প্রকাশ নেই। তারার বড়বোনের জামাই শহরের বড় কলেজ ভর্তির সব ব্যবস্থা করলো। ক্লাস শুরু হতেই শহরে চলে গেল। তার হৃদয়ের ক্ষত তখনো শুকায়নি। আর্তনাদ আর হাহাকারে কোন রকমে কেটে যায় দিনগুলো। ওর এক সহপাঠী জীবন কেমন করে জানি তা বুঝে ফেলল। জীবন শহরের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে। সুদর্শন, আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত এক যুবক। তারার কাছাকাছি আসার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করতে থাকে। সহজ হয়নি, তবে জীবন পেরেছিল তার কাছে যেতে। আহত মানুষ যেমন একটু আশ্রয় পাওয়ার জন্য সহজেই নিজেকে অন্যের কাছে সপে দেয়, তারাও তেমিন জীবনের কাছে নিজের জীবনটা সপে দেয়। কি করে সম্ভব হয়েছিলো তা জানি না, তবে অতি অল্পদিনের মধ্যে ওরা সবার অগোচরে বিয়ে করে ফেলে। কেউ কিছু জানেনা। ওরা ওদের মত চলতে থাকে।

ওদিকে ধলামিয়া কোন চাকুরি পেয়েছে কিনা জানি না। তবে সংস্কৃতিপ্রেমী যাত্রাপালার নায়ক জীবন যুদ্ধে বারবার পরাস্ত হলেও পালার নেশা ভুলতে পারেনি। ফিরে এসে আবার নাম লেখায় যাত্রাদলে। যাত্রাদলের সবাই মহাখুশি। ধলামিয়া দলের সাথে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চষে বেড়াতে লাগল। মনের মধ্যে এক খণ্ড জ্বালা নিয়ে সে খাঁটি হতে লাগল। তার অভিনয় আরো বেশি নিপুণ হতে লাগল। কেবল তার একটাই আফসোস তারা কোন দিনই তার অভিনয় দেখল না। আজ আরেকটা পূর্ণিমার রাত। আকাশে চাঁদের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট থাকলেও তার মনে হয়, তারার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বেশ টাকা কড়ি খরচ করে নদীর ওপাড়ে যাত্রাপালার আসরের ব্যবস্থা করেছেন ইউনিয়নের সদ্য নির্বাচিত চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠানে এমপি মহোদয়ও আমন্ত্রিত। সকাল থেকে যাত্রাদলের পুরো ইউনিট নদীর ওপাড়ে। শুধু ধলামিয়া রয়ে গেছে স্কুলের বিচিত্রানুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষ হলে হারমোনিয়াম এবং পালার নির্দেশককে সাথে নিয়ে যাবেন বলে। অনুষ্ঠান শেষে ধলামিয়া এবং স্যার স্কুল থেকে বের হয়ে প্রধান রাস্তায় এলেন।

-ধলা ভাই, তারা বু একটু আগে বিষ খেয়ে মারা গেছে, চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তারার চাচাতো ভাই মফিজ কোন মতে কথাগুলো বলল। ধলামিয়া নিঃশব্দে চোখের পানি ছেড়ে দিল। স্যার বেশ আফসোস করতে লাগল। মিষ্টি মেয়ে, খুব মেধাবী ছিল। কেন যে এমন করে অকালে ঝরে গেল। ধলামিয়ার মন বারবার বলছে, জাফর তুমি আজ যাত্রা পালায় যায়ো না। কিন্তু তা কি করে হয়। পুরো ইউনিট মেকাপ নিয়ে রেডি। সাথে স্যার রয়েছে। ওদিকে চেয়ারম্যান সাহেবের মান সম্মান ।

-স্যার চলেন। ধীর পায়ে ধলামিয়া এগিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই তারার বিষপানে মৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নানান গুজবে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। তবে ঘটনাটি মোটামুটি এরকম। যদিও সত্যটা কি ছিল তা একমাত্র তারা এবং তার সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানে। আজ সকালে জীবন এবং তার দুই বন্ধু শহর থেকে তারাদের গ্রামে এসেছিল পাখি শিকারের জন্য। ওরা এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে কয়েকটি পাখি নিয়ে তারাদের বাড়িতে গেল। শিকদার বাড়িতে মেয়ের কলেজের ছেলে বন্ধুরা বেড়াতে এসেছে, বিষয়টি অকল্পনীয়। শিকাদর বাড়িতেই ছিলেন। তিনি রেগেমেগে আগুন। যতসব অশ্রাব্য ও অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করে ওদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। তারা তার স্বামীকে অপমান করার যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে, অভিমানে ঘরে থাকা জমিতে দেওয়ার কীটনাশক পান করে নিজের জীবনটা বিসর্জন দিয়েছে। ওদের বাড়িতে এটাই যে একমাত্র বিয়োগাত্মক ঘটনা তা নয়। মিথ্যা আভিজাত্য ও বংশের সম্মান বজায় রাখার জন্য এর আগেও অনেক স্বপ্ন ও জীবন ঝরে গেছে। ওদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা সুযোগ পেলেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। তবু শিকদার এবং তার গংরা তাদের দাম্ভিকতা থেকে একটুও সরে নি। শিকদার ক'দিন আগেই তার বড় ছেলেকে ত্যাজ্য করে তাড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত সম্পত্তি ছোট ছেলের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। বড় ছেলের অপরাধ সে নিজের পছন্দে অপেক্ষাকৃত নিচু বংশে বিয়ে করেছে।

আজ সন্ধ্যা পালাটি মঞ্চস্থ হলো। ধলামিয়া অনেক বেশি পেশাদারিত্বের মধ্য দিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছে। তার নিপুণ সংলাপ আর অভিনয়ে সবাই আনন্দিত। একের পর এক হাতে তালি। রাত তিনটায় পালা শেষ হলো। দর্শকেরা ধলামিয়ার অভিনয়ের প্রশংসা করতে করতে দল বেধে চলে গেল। ইউনিটের সবার থাকার ব্যবস্থা হলো চেয়াম্যান সাহেবের বাড়িতে। ধলামিয়া স্যারকে বলল, স্যার চলেন আমরা যাই। আমি রাতেই একবার তারাকে দেখতে চাই। ওদের বাড়িতে প্রায় দেড় বছর ছিলাম। একসাথে কত স্মৃতি। স্যার আমি ভুলতে পারছিনা। স্যার ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মাঝিকে সাথে নিয়ে নদী পার হল। ধলামিয়া তারাদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। ইতোমধ্যে খবর পেয়ে ঐ রাতেই তারার সব আত্মীয় স্বজন চলে এসেছে। অনেকদূর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ধলামিয়া মেইন রাস্তা থেকে তারাদের বাড়ি যাওয়ার সরু গলিতে পা দিতেই চমকে উঠল। সামনেই অনেকগুলো তারা। সবার মুখে মায়া হাসি। পরনে সাদা পোশাক। দল বেঁধে ওর দিকে আসছে। কি আশ্চর্য ! কাছাকাছি এসেই সবাই ডানা মেলে মাথার উপর দিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। তারা পিছন থেকে ধলামিয়াকে ডাক দিল। ধলামিয়া ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকায়। কই, কেউ নেই তো। আবার সামনে তাকায়। থমকে দাঁড়ায়। সমানেই তারাদের দল। ধলামিয়ার পা আর চলে না। তারাদের বাড়ি থেকে কান্নার ভয়ানক সুর শোনা যাচ্ছে। ধলামিয়া দক্ষিণের ঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়লো। তারা শুয়ে আছে। একখান সাদা চাদরে ঢাকা। কেউ একজন মুখ থেকে চাদর খানা সরিয়ে দিল। পশ্চিম আকাশের চাঁদের আবছা আলো তারা মুখখানি ছুঁয়ে গেল। ধলামিয়ার বুকটা আড়মোড় দিয়ে জেগে উঠল। মনে হতে লাগল যদি সেই রাতে তারাকে নিয়ে আজানা সেই রংপুরে চলে যেত তাহলে আজ এমনটা হতনা। ধলামিয়ার নিথর দেহ ধপাশ করে মাটিতে পড়ে গেল। চাচীজান এবং বোনেরা ধলামিয়াকে জড়িয়ে ধরে আরো বেশি শব্দ করে কাঁদতে লাগল। চাচীজান বারবার বিলাপ করছে, জাফর আমার একি ক্ষতি হল, আমার একি ক্ষতি হল। চাচীজানের বিলাপ আর বোনদের কান্নায় ধলামিয়া আর স্থির থাকতে পারলনা। সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে, ধনী-গরীব, প্রভু-ভৃত্যের পার্থক্য ভুলে ওদের সাথে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

লেখক: প্রভাষক, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

স্মৃতিতে ঢাকা ভালোবাসা

নওরিন তাসনুমান

শ্রাবণের দুপুর। রিক্সা করে শহরের ব্যস্ততম পথে একলা অনু চলেছে বাড়ির উদ্দেশ্যে। আকাশে মেঘ বার বার ডেকে উঠছে। অনু বেশ চিন্তিত মুখে, মাথা নীচু করে রিকশার হুট পেরিয়ে আকাশটা দেখলো। শ্রাবণের আকাশে মেঘের ঘনঘটা। অথচ আপুর বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বেশ রোদ ছিল। বেড়াতে গিয়ে আপুর বাসায় সে তার ছেলে অর্নবকে রেখে এসেছে। বাড়িতে ছেলের বাবা ছেলেকে না দেখতে পেলে বেশ রাগ করতে পারে। অনুর এই প্রিয় মানুষটির কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল তার আল্লাদী করে কথা বলা চার বছরের ছেলে। প্রিয় মানুষটির রাগ দেখতেও অনুর বেশ মজা লাগে। অনু আর অর্নবের ভালোবাসার জালে আটকা পড়ে বেচারার বড় হিমশিম অবস্থা। অফিস থেকে ফোন করে কতবার যে খোঁজ নেয়। অনু বাবু কি করছে? অনু, তুমি ভালো আছো তো? সকালে তোমার ভয়েজটা ভারী মনে হয়েছিল ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি? অনু যদি হেসে বলে, না, আমি ঠিক আছি। তাহলেও বিপ্লবের হাজারটা প্রশ্ন। অবশেষে তার আশংকা ভুল হওয়ার খুশিতে ঝলমলে কণ্ঠে তার আবদার, বৌ আজ কিন্তু ঝাল ঝাল করে রুই মাছ রান্না করো, প্লিজ লক্ষী বৌ আমার। মনে মনে ভাবে, বিপ্লব একটা পাগল। অনুর হাসি পেল এই ভেবে। তবু সারাজীবন সাধনায় বিপ্লবের মত এমন একজনকে পাশে পাওয়া যায়। হঠাৎ পেছনের রিক্সার ধাক্কায় ভাবনায় ছেদ পড়লো অনুর। এবার অপেক্ষার পালা, রাস্তায় জ্যাম লেগেছে। বিরক্তিতে অনু ভ্রু কুঁচকাতে গিয়েও পারলোনা। রিক্সার কিছুটা দূরে তার স্কুলের নীল রঙের গেট। অনু গেটের দিকে তাকাতেই তার হৃদয় বুঝি কিছুটা আন্দোলিত হল। মস্তিষ্কের অযুত নিযুত নিউরণগুলো হৃদয়ে পুরোনো স্মৃতির বাসি অনুভূতির সংকেত দিল যেন। তার প্রিয় স্কুল। শৈশব কৈশোরের ঝর্নার উচ্ছলতায় বান্ধবীদের সাথে গল্প করতে করতে এই পথ দিয়েই তো স্কুলে যেত সে। এসএসসি পাশের পর থেকে তৃপ্তিতে তখন সমস্ত পৃথিবী তার মনে হত স্বর্গ। সেই থেকেই স্কুলের সাথে সাক্ষাত নেই। আচ্ছা এখন স্কুলে একবার ঘুরে আসলে কেমন হয়? জীবনের প্রিয় মুহূর্তগুলো কাটানোর স্থানটিকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে লঘু পায়ে সে গেটের সামনে এসে হাজির হল। মনে হল, ১২ বছর আগে ফেলে আসা তার শৈশব কৈশোরের পৃথিবীর দরজা ঐ পাশে লুকিয়ে আছে। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। তখনকার আনন্দময় মুহূর্তগুলো আর একবার খুঁজে নেয়ার ব্যাকুলতা তাকে গ্রাস করছিল। তবু কী শান্ত ভাবে ছোট দরজাটা খুলে মাথা নীচু করে ঢুকে পড়লো। ক্লাস আওয়ার হওয়ায় চারদিক ভীষণ চুপচাপ। দারোয়ান মামা সব সময়ের মত গেটের পাশে নেই। এই তো সেই মাঠ। ধূলো ওড়া এক পাশে একটু ঘাসের সমারোহ। পুরোনো স্কুল বিল্ডিংগুলো নতুন রঙে দাঁড়িয়ে আছে। ইট বিছানো পথ চলে গেছে স্কুলের এমাথা থেকে ওমাথা অবধি। নতুন কিছু গাছও দেখা যাচ্ছে। তার অস্থির চোখ চলে গেল একটি লিচু গাছের দিকে। ছোট গাছটা কত্ত বড় হয়েছে! এর নীচে দাঁড়িয়েইতো বোকার মত নিয়াজ স্যারের জন্য অপেক্ষা করতো সে। কখন স্যার টিচার্স কমন রুম থেকে বের হবেন আর অনু ছুঁটে গিয়ে স্যারকে সালাম দিবে। স্যার যদি একটু হেসে বলে, কি অনন্যা ভালো তো? লাজুক লাজুক মুখে ভালো বলবে সে। তার চোখে মুখে খেলা করবে চাপা দ্যুতি। নিয়াজ স্যার নামটা ছিল তার শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের একটা মাধ্যম। তার ভালো লাগা বোধের বিষয় পরিবর্তনের নিয়ামক। আর এই পাকামো পরিবর্তনের জন্যই তো তা ছিল অপরিণত হাস্যকর প্রেম। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বহুদিন পর অনু হাত রাখলো চেনা লিচু গাছে, যেন স্মৃতির ডালার হাতল ওঠানো হল। ফাঁকা স্কুল মাঠটায় খণ্ড খণ্ড চিত্র ভেসে উঠলো, ঢেউয়ের মত একের পর এক। দুই বেণী করা হাসি মুখের

মিষ্টি একটি মেয়ে। বড় বড় চোখে যার বাঁধন ছাড়া স্বপ্ন। মাঠের এ প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত হাজারটা কিশোরী অনু দিয়ে ভরে গেল। কোথাও বান্ধবীদের সাথে গল্প করছে সে, কোথাও দাগ কেটে খেলছে বৌছি। কোথাও চঞ্চল অনু স্যারের সাথে গল্পে মশগুল। কোথাও আবার বিষণ্ন মুখে হেঁটে আসছে স্যারের সাথে দেখা হল না বলে। চৌদ্দ বছরের ইচড়ে পাকা অন্য রকম এক প্রণয়। তবু কি তীব্র ছিল অনুভূতি। আকাশ ডাকছে। অনু স্কুল মাঠের আকাশটা দেখলো। মনের পড়লো কোন এক দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছিল। টিফিনে বারান্দায় এক কোনে বিষণ্ন মনে বৃষ্টি দেখছিল সে। নিয়াজ স্যার ছুটিতে ছিলেন। এক বুক অভিমান নিয়ে ভেবেছিল বৃষ্টি আজ তার কান্না। রাগ হচ্ছিল ভীষণ। মনে হচ্ছিল, আসুক তিনি সরাসরি সামনে গিয়ে বলবে "আপনার সাথে বৃষ্টিতে ভিজতে চাই"। ছেলে মানুষী, কিন্তু কী সাহসী ইচ্ছা ছিল সেটা এরপর টইটুম্বুর আবেগ নিয়েই স্কুল জীবনের সমাপ্তির ফিতা কাটতে হল। তবু ফিতা তো থেকেই যায়, রঙটা ফিকে হয়ে যায় কেবল। ফিকেই তো, কারণ এতদিন পর তার ছেলেবেলার প্রেম মনে পড়লো। কিন্তু অনুভূতিগুলো সময়ের পিঠে চড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কে জানে। ব্যস্ত জীবনের গতি যখন ভীষণ, তখন স্মৃতিরা কেবলই স্ন্যাপশট। আজকের মত এত দিন পর এখানে আসা হল বলেই না নস্টালজিয়া! হঠাৎ পেছন থেকে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, ক্ষমা করবেন, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন? অনু হতচকিত হয়ে পেছন ফিরলো তার হার্ট একটা বিট মিস করলো যেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার কৈশোরের প্রেমের মানুষটি। এক কালের লম্বা, কর্সা, সদা-হাস্যময় ব্যক্তিত্ববান স্যারটা কি বুড়ো হয়ে গেছে! স্যার বললেন, আপনি গার্ডিয়ান হলে প্লিজ ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করুন। চারটায় ছুটি হবে। এভাবে স্কুলের ভেতর ঘোরাঘুরি না করলেই ভালো। অনু এবার স্যারের বিরক্তি মাখা চোখের দিক পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। এক সময় ওই চোখে চোখ পড়লে তার পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যেত। আজও যেন হৃদয়ে মৃদু কম্পন অনুভব করলো। আশ্চর্য ব্যাপার এতদিন পরেও অনুভূতি ঠিক আগের মতই আছে!! অনুভূতিরা কী তাহলে বিশ্রামে ছিল? অনু কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সালাম দিয়ে বলল–

'দুঃখিত আমি আসলে এক সময় এই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম আজ একটু বেড়াতে এসেছি এখানে। তারপর একটু থেমে যোগ করলো-

'স্যার আমি আপনার ছাত্রী ছিলাম।
এবার স্যারের কণ্ঠে কৌতুহল-'আপনি কত সালের ব্যাচ? নাম কি আপনার?

-অনন্যা। ৯৯ এর ব্যাচ। মৃদু কণ্ঠে অনন্যার উত্তর।

স্যার ভ্রু কুঁচকে চেনার চেষ্টা করছেন। অনু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আজ কতদিন পর আবারো সেই পরিচিত মাঠে দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উনি অনুকে চিনতেই পারছেন না অথচ অনুর বুকে কিশোরী বেলার অনুভূতিগুলো লুকোচুরি খেলেই যাচ্ছে।

প্রকৃতির বড় রোমাঞ্চিত খেলা খেললো! ঝুপ করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামালো। মাঠে তারা দুজন। বিব্রত মুখে স্যার হাতের ছাতাটা খোলার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। অনুর চোখ জ্বালা করছে। জীবনের কোন মোড়ে আজ তারা তিনজন একসাথে!! অনু, স্যার আর বৃষ্টি!!! কোনমতে ছাতা খুলতে খুলতে স্যার দ্রুত পায়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন। জানলেনও না ধোঁয়াটে বৃষ্টিতে অনুর পাশাপাশি অজান্তে কিছু মুহূর্ত কাটিয়ে পূরণ করে গেলেন কোন এক হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছে। অনু ধীর পায়ে হেঁটে আসছিল। স্মৃতির ডালায় পড়ে থাকা ধূলো বৃষ্টি হয়ে তার চোখ ঝাপসা করে দিয়েছে। পেছন থেকে বৃষ্টির শব্দ ভেঙে স্যার কি ডেকে উঠলেন অনন্যা বলে? স্যার কি তাহলে

শেষ মুহূর্তে তাকে চিনতে পারলেন? ডাকুক! অনন্যা তাকাবে না এক সময় তার হৃদয়ই ছিল তার বাধভাঙা প্রেমের চারণ ভূমি। অনুভূতির গোপন ইমারতটা কেবল তার একার ছিল। স্যারকে কখনো বলা হয়নি ভালো লাগে। আজ সময়ের পরিবর্তনে সুখী একটি পরিবার সে পেয়েছে বিপ্লবকে। সে অনেক ভালোবাসে, তবু তার হারিয়ে যাওয়া ছেলেমানুষী ইচ্ছেটা পুরণ হয়ে আজ যেন তা পূর্ণতাকে ছুঁয়ে গেল। অল্প বয়সে প্রেমে পড়া নিয়ে তার মনে যে গ্লানি ছিল, আজ এতদিন পর বৃষ্টির জলে তা ধুয়ে গেল। থাক না কিছু ভালোবাসা হৃদয়ের এক কোণে জমা হয়ে। কি দোষ তার? রেল লাইনের মত জীবন তো এগিয়েই চলবে। পেছনে পড়ে থাকুক সোঁদা গন্ধের মিষ্টি কিছু স্মৃতি, স্মৃতিতে ঢেকে থাকুক তার ভালোবাসা।

এমনই কিছু এলোমেলো ভাবনায় অনু ডুবে রইলো।

লেখক: শিক্ষার্থী, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

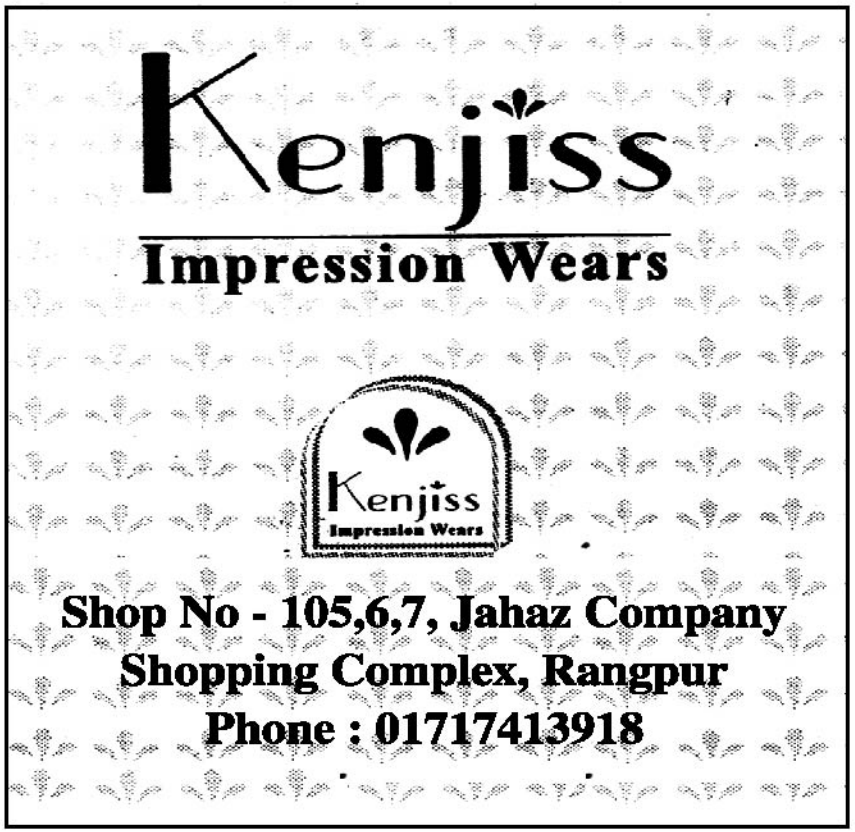

গল্প

বৃষ্টি কন্যা

আফিফা ইশরত চেতনা

পূব আকাশে লাল রক্তের ছটা। নতুন একটা দিনের শুরু। আরেকটা দিন। আরও কাজ আরও ব্যস্ততা। দিনের শেষে রাত, রাতের পর আবার নতুন দিন, কিন্তু শেষ নেই ব্যস্ততার। কাজ আর কাজ। ঘড়ির কাঁটা অবিরাম চলছে আপন গতিতে, পৃথিবীর মত আর আবর্তন হচ্ছে দিন রাতের। ঘড়ির কাঁটার সাথে বাইরের চিত্রের অবশ্য তেমন কোন মিল নেই আজ। অফিসের জন্য দ্রুত হাতে তৈরি হচ্ছে সুমন।

গ্যাসের চুলায় চাপানো হাড়িতে ফুটছে চায়ের জল। হাড়িতে যেমন ফুটন্ত গরম জলের তাণ্ডব বাহিরেও তেমনি শীতল জলের তাণ্ডব চলছে সেই মধ্যরাত্রি থেকে। আকাশ থেকে জল মাটিতে পড়ে আবার ছিটকে উঠছে কাদা মাটিসহ। জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে ছন্দা, ফুটন্ত চায়ের জলে মনোযোগ নেই তার। অবিরাম ঝরে যাওয়া বৃষ্টির দৃশ্য দেখছে সে অপলক। আর ভাবছে চার বছর আগের বর্ষার সেই দিনটির কথা।

দিনটি ছিল ১লা শ্রাবণ। অর্থাৎ মধ্যবর্ষা। সকাল থেকেই অঝোর ধারায় ঝরে যাচ্ছিল বৃষ্টি। সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে বধূবেশে বসে থাকা ছন্দাকে স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর সেজে এল সুমন। সুমন দু'ব্যাচ উপরে পড়ত, যে ছেলেটির চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যেত ছন্দা। সেই রাতে সুমনের হাত ধরে ছন্দা পা রেখেছিল এক নতুন জীবনে। বৃষ্টি আর সানাইয়ের সুর সে রাতটি নিদ্রাহীন কেটেছিল দুজনের। বৃষ্টি দেখে দেখে ... সে সময়ের কথা মনে পড়লে এখনও মনে শিহরণ জাগে ছন্দার। এ জন্যই তো বর্ষাকাল তার কাছে বিশেষ গুরুত্বের। শুধু কী এজন্যই? হয়তো নয়। তার মনে পড়ে যায়, দু'বছর আগের বর্ষার সেই কালো দিনটির কথা।

দিনের শুরুটা কালো ছিল না। স্বপ্নের মতোই শুরু হয়েছিল দিনটা। ছন্দা যখন নতুন স্বপ্নে বিভোর। দু-এক দিনের মধ্যেই ভরে যাবে তার কোল। যে বর্ষায় তার জীবনের এসেছিল সুমন সেই বর্ষাতেই সুমনের সন্তান তার কোলে এসে আলো করবে তাদের ছোট্ট সংসার। ছন্দা অনুভব করতে থাকে তার সন্তানের আগমন বার্তা আর বাইরে কালো হয়ে আসে আকাশ। শুরু হয় তুমুল বর্ষণ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা ছন্দাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য পাগলের মত গাড়ির সন্ধান করতে থাকে সুমন। পেয়েও যায় একটা গাড়ি। ছন্দাকে গাড়িতে তুলতে তুলতে বলে, একটু ধৈর্য্য ধর, একটু পরেই মাতৃত্ব তোমার কষ্টের অবসান ঘটাবে। কিন্তু সে যাত্রায় ছন্দার আর মা হওয়া হয়নি। বৃষ্টিভেজা পিছল রাস্তায় গাড়ির চাকা পিছলে পরার আগেই শূন্য হয়ে যায় ছন্দার কোল। ২৪ ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরলে সে জানতে পারে, তার সন্তান তাকে মা বলে ডাকার আগেই চলে গেছে দূর কোন দেশে।

ডুকরে কেঁদে ওঠে ছন্দা। হাড়িতে চায়ের জলের তাণ্ডব উপেক্ষা করে অশ্রু সিক্ত চোখে আকাশের কান্না দেখতে থাকে সে। বর্ষাকাল, বৃষ্টি, আকাশে বিদ্যুতের আলো ঝলকানি ছন্দার জন্য সুখের নাকি চরম বেদনার? এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দুলে ওঠে তার পৃথিবী। চুম্বক আকর্ষণে মাটি টেনে নেয় তাকে। জ্ঞান ফেরার পর মাথার পাশে বসে থাকা সুমন তাকে বলে, ডাক্তরকে ফোন করে দিয়েছি মনে হয় ভাল খবর।

সুমনের কোলে মাথা রেখে ভাবতে থাকে ছন্দা এই বর্ষা কি তার জন্য কোন স্বর্গ-সুখ নিয়ে আসছে? নাকি তার জীবনের আনন্দ বেদনা সবই যেন এই আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষাকে কেন্দ্র করে। ছন্দা কি তাহলে বৃষ্টি কন্যা?

লেখক: শিক্ষার্থী, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

বিবর্ণ স্বাধীনতা

মনোয়ার হোসেন

হাতে লম্বা বাজারের লিস্ট, বিদ্যুৎ বিল, ওষুধের প্রেসক্রিপশন। পকেটে সীমিত টাকা। ফাল্গুনের তপ্ত রোদে স্টেডিয়াম দিগন্ত মাথায় দরদর করে ঘাম ঝরছে। হাতের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বাজারের উদ্দেশ্য রওনা দিল সৌমিক রায়। শরীরের রগ আর শিরা-উপশিরায় রক্ত কণিকার দ্রুত আসা যাওয়া। রক্তবর্ণ চোখ জোড়া দিয়ে অনুক্ত কথার নীরব অগ্নিবর্ষা ঝরছে। সে ফুলকি স্ত্রী, পরিবার না রাষ্ট্রের উপর তা বোঝা কঠিন। মৃত্যুকে হাতে নিয়ে বীরদর্পে যুদ্ধ করেছে দেশ স্বাধীন করার জন্য। দেশ আজ বহিঃশত্রু মুক্ত। মুক্ত মানুষের মূল্যবোধ আর নৈতিকতা। আকাশ, বাতাস, নদী-নালা, মানুষ, মা, মাটি ও মাতৃত্ব সবই স্বাধীন।

স্বাধীনভাবেই তো চলছে সব। উন্মুক্ত মনে আকাশে পাখি উড়ছে, শিকারী শিকার করছে। চাল, ডাল, তেল, লবণ, সব কিছুরই পাখা গজিয়েছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয় মহাকাশযানের মতো ক্রমবর্ধমান। মজুদদারী স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রেখে পণ্য গুদামজাত করছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন মানুষের পকেটে থাকে। কি থাকে না? মোবাইলের মাধ্যমেই চিকিৎসা নেওয়া যায়। এই ধরুন বাংলায় শুনতে চাইলে এক চাপুন, ইংরেজিতে দুই, মাথা ব্যথার তিন অথবা বুক ব্যথার চার ইত্যাদি। আর হাসপাতাল? সে তো মানুষ কাটার কারখানা। আর শিক্ষারতো এখন পোয়া বারো। টাকা হলে বাড়িতে বসেই নামী দামি ডিগ্রির সার্টিফিকেট।

আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবস্থা চরম হাস্যকর। জোড়ায় জোড়ায় খুন, গুপ্ত হত্যা। যত্র তত্র বন্তাবন্দি অথবা খণ্ড খণ্ড বেনামী লাশের আনাগোনা। পুলিশ আর সন্ত্রাসীর নিবিড় বন্ধুত্ব। নিরীহ ছাত্র অথবা সাধারণ মানুষকে অপরাধী সাজিয়ে রিমান্ডে নেওয়া প্রাত্যহিক আয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনের সন্ত্রাসী পালন। সাধারণ ছাত্রের মৃত্যুর কোন তদন্ত বা বিচার চাওয়াটা বাড়াবাড়ি। সীমান্তে কুকুরের মতো মানুষ হত্যা, আইনের অপপ্রয়োগ আর কথার ফুল ঝুঁড়ি আমাদের দেশের প্রতিদিনের স্বাধীন কালচার।

নানা অসংগতিতে জীবন প্রায় অসহনীয়। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখ জোড়া অভিমান ও রাগে রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে সৌমিক রায়ের, হ্যালো। কি ব্যাপার! এ্যালাও কোনটে কোনা, তোমরা কত্ক্ষণ হইল্ বাজারত্ গেইছেন, এ্যালাও আইস্যার নাম নাই। ভ্রম থেকে ফিরে সৌমিক রায় ভাবে, "হয়তো ...., বউয়ের কতায় ঠিক। বটগাছের তলত বসিয়া মুই এইগল্যান কী ভাববার নাগচোং।" দেশ স্বাধীনই, স্বাধীন ভাবেইতো চলছে সব। কিন্তু মজার ব্যাপার, অধিকার বঞ্চিত এইসব মানুষের কাছে স্বাধীনতা শব্দটির মূল্যই বা কতখানি।

লেখক: শিক্ষার্থী, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

The Labyrinth

Shahnaz Yasmeen

Shazia smiled half to herself and the rest to her memory as if paying tribute to it. Her smile was like the freshly plucked flowers blooming and smelling. 'So at length... he managed to ponder over my advice, 'she thought with a relief. She must have gone through the letter for the sixth time since its arrival, two days earlier. Stretching her neck out of the window she took a deep breath, "It's so refreshing reading letters with wonderful messages" she mused on, humming a tune somewhere from her adolescent age, a song of Lata Mangeshkar, her preferred. How could she recall this tune? Surprising! Apparently, she questioned to herself, hardly recollecting the lyrics of the song. While piling the files one on the top of the other she didn't forget to look at the heads of them. She had to set off for the business meeting within an hour and prior to that she had to restructure her files and give the final touches to the presentation. She has been an Executive Director in an international firm for the last fifteen years. Her sincerity, efficiency and arduousness never made her look back since her joining and she kept on ascending the winding stairs steadily and efficiently.

For the time being, she was preoccupied with the thoughts of her African friend Lawrence from South Africa, a shy, reticent and particularly grave person in his late thirties. He happened to be her classmate in London during her study at London School of Business and Management He scarcely spoke to anybody, but a few seminar presentations with Sazia made him nonrestrictive with her and they spend most of their time in discussion and preparation of their presentations; never having time for fun. They conversed, argued, jotted down notes for hours together, and bending over heaps of books, notes, slides, and transparencies, with sips of tea in between.

Shazia could still call to mind, only once in the midst of their discussion he impulsively uttered, "You Bangladeshis are gentle like the petals of flowers and generous as soil". Somewhat surprised at the utterance she looked at him in amazement, "What makes you think so"? "You" a brief reply and then again he picked up the book. His epigrammatic reply gladdened her with the understanding that at least he could come out of his cocoon. Time kept on flying gracefully for the timekeepers and awkwardly for the sluggards. They were too engrossed in their work, running to the Institute, rushing to the library, returning to the halls with heaps of books and spending the evenings and nights in the computer rooms. Not much, time to say anything to anybody, except, exchanging passing hellos and mechanical smiles. In addition, at times, bouts of depression and inertia overpowered all other feelings. It must be around this time when the whispers and undertones from one ear to another pulsated the Halls of residence that Lawrence had fallen for Allen. 'How come? How did it happen'? Everybody's lip

was vibrating with the same query. It was most normal and natural for anybody but Lawrence...sounded somewhat bizarre and incredible. Oscar their classmate and vital informer revealed the secret.

The seemingly impossible actually occurred when a group of foreign students was selected for a visit to Stratford on Avon and Lawrence and Allen being a part of it. All the students had to stay in youth's hostel and had to cook and share the food and Lawrence and Allen being the only Africans decided to cook together and then…

Ladies occupied the first floor in the Halls of Residence. Allen's room was next to Shazia's, and Lawrence stayed in a different hall. One late night, around two in the morning and as usual Shazia getting ready to call home as it was eight in the morning by Bangladeshi time heard someone tiptoeing nearby her door and instantly she knew it was her Sri lankan friend Rhoda who always came with her downstairs to the telephone room at that hour of the morning for giving her companionship. Unlocking the door Shazia looked out and to her surprise and disbelief discovered Lawrence at Allen's door. So 'there's no smoke without fire', she thought, quietly closing the door And then it became a regular phenomenon and every night she heard footsteps coming close to her door and then complete silence and after a few days everything went virtually unnoticed just like a passing winter breeze.

A tremendous passion for cooking often drove Shazia to the pantry and for a change of taste; she time and again experimented on her wonderful recipes. And many a times, found Lawrence busy cooking in the pantry. Sometimes she would ask him casually about his cooking. He always seemed slightly embarrassed and often with a shy smile replied her. One evening she found him making chicken soup. With a twinkle in her eye she inquired"For Allen possibly". "Yes" Very briefly he said and left the pantry as soon as he could. Shazia secretly decided that Lawrence was probably skilled at making soups. Almost every other day he was seen in and around the pantry, though he made it definite not to enter the pantry while somebody was around. Another day she caught him frying something. "Oh Lawrence it smells delicious" she craned her neck to see what was in the frying pan. He looked up from the pan and with greatest sincerity asked, "Would you like to have some. It's our dish we make out of meat". "No! No! Thanks a lot I just finished my lunch". She waved her hand. She filled her pot with water and after placing it on the stove turned towards him "Lawrence, may I ask you something". "Yes" he turned to her questioningly. "Please do, I like you. I don't mind". Shazia looked at him and said seriously, "Actually I was wondering that cooking consumes a lot of your time and at this moment when all of us are so wrapped up with dissertation writing don't you think you are spending too much of your time in the pantry"? "Actually Shazia, Allen is very fond of the food I make and besides that she is too committed to her studies and therefore I cook for her". "And you?" She asked with

all her earnestness. "Aren't we all supposed to be committed too? Would it be fair if you are left behind?" she inquired with a concern in her eyes. As usual, Lawrence's reply was a single nod and he gently said, "Yes you're right" and went out.

Whether things were rough or smooth in between them, Shazia never had any interest in it. Deadly committed to studies, she remained preoccupied with her dissertation for days. Mild summer bright days to dark mornings, dismal evenings, rainy days, shivering cold, snow, and hailstorms kept them so much in a world of their own and work that they did not had time for whispers and undertones. They even stopped thinking about combing their hair or choosing dresses or making a delicious treat for themselves, despite being tired of the routine food from the hall's kitchen. Only their ears enthusiastically awaited the panting voice of prompt Margaret, their typist, who used to come every afternoon with the typed out sheets of their dissertations. The moment her voice resounded through the corridor all of them rushed out of their rooms like the rats of the town of Hamilton and Margaret's distribution of the sheets of paper was worth seeing. Time nearly stood still as the ship of Ancient mariner's, in the middle of the frozen sea.

Finally, with the submission of the dissertations everyone felt relieved. Thoughts stored away for the time being were revived in sparkling brightness and shining pearls of stories started rolling from one hall to another. Once the intensity of anxiety lessened, everyone started gossiping about the shortly forgotten single couple in the class.

They hardly had anything to do before the convocation, so Shazia decided to spend a few days with her aunt in Edinburgh. Her aunt lived in the suburbs of Edinburgh and she was sure that she would love to have her in her house. Her cousins were also greatly delighted to find her among them. Shazia had a lovely time with them. Her cousins took her to Scott's monument and she all on a sudden fascinated with the idea of viewing the whole city at a glance, impulsively paid a dollar to ascend that 200 feet high monument. Her cousin didn't approve of her idea and therefore decided to stay in the garden below. There were 287 steps to climb but when she was halfway, she nearly died of exhaustion but thanks God she had an apple and some crunchy potato chips in her bag to gulp happily down her throat. Nevertheless, it was worth climbing. She viewed the whole city from there. Everything looked fantastic from that altitude. The undulating roads, snow capped mountains far in the distance looked luminous. The Edinburgh castle, Princes Street, Queen's streets and many other streets laid all spread in front of her in all their varied colours, shapes and hubbub and all of a sudden, she felt like Juno sitting on the top of Olympus keeping an eye on the mankind. Moreover, that feeling of power imbued her with enough energy to climb down which was no less another bone cracking experience.

The next few days she spent visiting Edinburgh Castle, Abbottsford House, Holyrood Palace, Edinburgh Zoo, Scott's view and many other places of scenic and historical importance. She hardly remembered the agonies of the result and as a carefree bird twirled and whirled around the city enjoying extensively.

Time ticked by reminding her to return and on coming back found nearly everyone in the halls of residence busy packing his or her luggage. The only people who were oblivious of everything were Lawrence and Allen. Nearly all the time they were together clinging to each other as if they wouldn't allow the time to flee away from them; desperately trying to bring the gusty time to a standstill. Shazia also had to do her packing and almost every other day went window-shopping, picking gifts for every one. This was a tough task, she had never been very good at it, and so it kept her so busy that she barely remembered anything. She spent her mornings in shopping and evenings, in sightseeing and never had time to see the Buckingham Palace or London museum. That day she decided to give herself a treat of a visit. Walking through the Street towards James Park, she saw a couple hanging to each other. She was glad to see them and so she reached them in a leap "Hi Lawrence, Hi Allen". Lawrence as usual politely extended his hand, "Hi Shazia it seems ages since I last saw you. Where are you these days"? "Drinking life to the lees". "Alone" Lawrence asked. "Oh yes, I'm not as lucky as you", she said with a twinkle in her eyes. Sensing Allen's discomfiture she took a quick departure from them and pulling the flaps of her coat trudged briskly towards the Buckingham Palace as if expecting the queen on the gates for her reception.

Days flew away smartly and finally the day arrived when the degrees were to be awarded through the convocation at the Westminster Hall. The grandeur of the Hall seemed to demean everybody in it, even the symphony. The elegance, grace and dignity of the whole ceremony nearly took her breath away. Feeling elated at her turn she received her award from the chancellor and in a flash the memory of all her family members and their sacrifice especially of her little daughter Sonia, sparked in her and her eyes got wet.

Convocation and their farewell parties seemed to pull everything to a sudden halt. Mixed feelings nearly got over everybody, the pleasure to be home with their near and dear ones and to say goodbye to so many lovely friends was really depressing. The moment of tearful farewells, good-byes and embraces arrived and since they were not parting together, the pain was excruciating. Time came when Allen was departing along with some other African friends. All of them were setting off for their respective countries at their own time in their own flights. Lawrence stood motionlessly in one of the corners of the hall. His dark pale face evoked pain and his agony was discernible. Allen was comparatively better. Slowly getting close to Lawrence and putting her hand on his shoulder Shazia asked him in a whisper," Aren't you going to the air port to see Allen off?" Trying to smile through his tears he just nodded.

Allen left, leaving Lawrence distressed and lonely as an owl at daytime, sequestering itself to a remote corner scarcely frequented. Few days were left for the departure of the rest of the students. No work and very negligible number of friends and in some cases the intimate ones gone, naturally silence used to brood over the halls. It echoed with the few steps of those who moved around like ghosts. The whole place looked like a zone evacuated by the enemies and an alarming scare seemed saturated in the entire atmosphere and everyone was in one or the other hide outs to save oneself from the enemy raid. Most of the students usually spent their mornings shopping and making arrangements to send their goods home, and evenings, going round making the best use of their last days in London, exploiting their bus and tubes cards and concession tickets at various places.

Shazia was also busy like honeybees. Her closest friend in the halls Seema had also left and she didn't want to dispirit herself, therefore those days she gave herself nice treats, sometimes going out for Kentucky chicken and sometimes with pizza at the pizza hut. Often her evenings were spent in cooking for herself. One day while she was busy making Lentil soup, she heard Lawrence talking to someone. She called after him. He turned around and said "Hi Shazia, how's life"? "As usual, but a bit lonely. Very few of us are left at the last leg of our journey." "Yes, you're right. London has lost its charm" he spoke gently as he always used to. Shazia seemingly too engrossed in her work asked him, "Heard from Allen?" The mention of the name itself seemed to darken his face. "No, not yet" he said. " May be she is busy, after all a year is quite a long time," Shazia said as if trying to console the shattered soul standing beside her "It's over, I don't think she even remembers me at all", Lawrence said in an agonized voice. "What! What do you mean to say," Shazia turned round facing him. "What could she do, after all she comes of a different country." He immediately became defensive. "So...?" Shazia kept looking at him questioningly. Lawrence looked at her straight and said, "What do you think you would have done if you were in her place." "Me" being totally taken off guard Shazia stared back at him comprehending that he still expected a reply, she said with all her honesty' Then I'd have gone with you." "It's easy to say that Shazia, but in real life how can you do so. You are from Asia and I'm from Africa, how can you do so. After all you have commitments, job, and family, all in your country. It is sheer impossible," Lawrence said in a breath with all the disbelief in his eyes. "Lawrence whatever you said is right but if I'd have loved you, if not now, not today, but of course tomorrow I'd have joined you. Though you are right, it is very difficult, yet not unattainable. And you speak of commitments, what about your relation with Allen, isn't it a commitment too," Sazia said with all the rage in her eyes but confidence in voice, "Didn't you love each other, or was it sheer spending time?' She continued. "No, Shazia, don't say so it really hurts me I had been terribly attached to her. You can't

even imagine how I'm passing my days and nights." Anybody could have seen the pang in his voice and agony in his eyes. "So go to Kenya and ask her to join you in your country and if you find a good job in her country then why not stay there." All on a sudden a light seem to flicker in his eyes and he uttered in a voice as if trying to swallow the tears. "Thank you Sazia it is so sweet of you, I think I would do so, "Lawrence said with a determination in his voice. "Lawrence, have a little soup, lets cheer up your promise and your love for Allen," She offered him a bowl of soup. Lawrence took the bowl and sat in the pantry chair to finish it off. Shazia all on a sudden felt extreme compassion for this battered person.

That evening Lawrence stayed for the simple dinner she was preparing and they talked a lot about their personal lives, for which they never had time earlier.

Lawrence was a divorcee. His wife left him with a son for somebody else just two years after their marriage and after that, losing all interest and faith in women he never thought of getting married again and shared his life with his only son Morris. He couldn't even trust any woman to befriend with and now after all these years when his son was ten years old he was caught into the mesh of love. "Poor Lawrence," thought Shazia. In fact it was a kind of a new window that was opened to her because she could never think of an African with such an Asian trait in him. 'How much mistaken I was about these people," she thought, "after all how many Asians do we find like him?" Shazia argued with herself.

The last days in London were too hectic to ponder over other issues. On the day of her departure, Lawrence was there at the airport looking gloomy and distressed and while shaking hands with him she conveyed her earnest good luck. Lawrence smiled and said, "I'll let you know..."

Shazia remembered everything in a flash of a moment. After ten months of her return to her country, getting too busy with her family and work she could hardly remember anything and then came this least anticipated letter in her hands. Lawrence had stated that after a lot of thinking, he had decided to go to Kenya and propose Allen to marry him or come with him to Ivory Coast or he might stay back. Shazia was very glad for him but at the same time she also conceived that it must have been very difficult for Lawrence to take the decision. But after all, all is well that ends well. So finally love was again charging the poor love torn.

High profile business meetings and commitments kept Shazia dreadfully engaged for nearly a fortnight and despite her utmost effort she couldn't scribble down few lines to Lawrence. All the while in the midst of her presentations she prayed silently for the couple that was about to tie knots and imagined herself to be the part of the whole ceremony showering huge baskets of flower petals on them.

Only a month later she could write Lawrence back with all her best wishes. Six months slowly passed by. Shazia expected a reply but no, there was nothing. Usually personal preferences become issues of dire importance and sometimes people getting mixed up with those, often put away many things behind them. Similarly Shazia in her good faith believed that Lawrence and Allen were after everything 'living happily ever after'. Usually all the comic stories have similar ends.

Shazia in her high profile job had to remain so delegated that despite all her wish could barely maintain any social life. It had been now two years since she had returned from UK and the pressure of the job was at its increase too. Emails have achieved prominence to ordinary mails these days and therefore these mails remained piled up for days together.

On that day Shazia had been entirely preoccupied with meetings and in the afternoon found a big pile of mails on the tray. Being awfully worn out she decided to put the task off for the next day and so before departing from the office she picked up the letters to put them in the drawer when the postmark of Ivory Coast caught her attention. In an instant Lawrence peeped through her inward eye. All her exhaustion disappeared. She abruptly opened the letter with all her zeal and unfolded it. But to her utter surprise she saw it was from somebody else, Farhan her nephew. With heaps of surprise she was informed that he was deputed to Ivory Coast as one of the members of the United Nations Forces. She knew that Bangladeshi troops were on move to various troubled zones in the world as UN forces. Some were heading for Somalia, some for Congo, Sierra Leone, Ethiopia, Kuwait and Ivory Coast too.

Farhan's letter was in fact a note of regret for not being able to meet her before departure. Shazia was so overwhelmed at Farhan's letter that she felt energized and immediately pulled her chair to scribble down few lines to him. She could envisage Farhan the eldest son of her sister, only a few years back recruited in the army and now far away in the war stricken Africa. Her eyes got wet. "May God take care of him," she prayed silently and in a fraction of a second she also remembered Lawrence. She mentioned him to Farhan and sincerely expected him to be a solace to him in a foreign land.

That was a tedious day of work and Shazia had to spend hours at a conference. Last night she had a row with her husband because of her commitments and it had left her too exhausted and miserable. The nature of her job used to keep her so delegated that time and again she failed to do justice to her home. When finally she reached her office, her mind and soul begged for some rest. Before saying good-bye to office she thought of checking her mail. "Oh, God, so many," she thought to herself and threw a cursory glance at the mails. Most of them were official except a few. She looked at her watch,

"Oh no, it's too late I would better deal with them tomorrow," she decided. She was about to sign out when Farhan's mail caught his sight. "At least I should read his one," she decided.

Farhan's mail had a reflection of gloom and depression in it. He wasn't happy being there; rather the war in the country has ingenuously demoralized him. Shell, mortar, bloodshed, the agonies of death, hunger, and all the accompaniments of war had distressed him to such an extent that she could visualize him weeping bloody tears. Though there were few Bangladeshi officers with him yet he was simply despondent.

Despite strict orders he could successfully made contact with Lawrence. As they were not permitted to visit any locals there, therefore he requested him to meet him. Lawrence, a nonchalant person was slightly scared at the unusual call for but when he met Farhan at the barrack and came to know the cause he was very pleased and offered him all his hospitality, which unfortunately he was unable to accept. Farhan had found Lawrence to be a nice, simple but lovely person, quite a depressed sort. He frankly told Farhan that he was not in a state of mind to write anybody at the moment. But he had requested him to convey his regards to his aunt and had taken her phone number and would give her a call at an opportune moment. Farhan's letter couldn't give her the vigor that she expected.

Just after a week, there was his call. Being worn out after a whole day's busy schedule and intrigued by a fresh cascade of rude remarks from her husband on the same issue of the deprivation of the family, she was lying low in her bed. Picking up the receiver in quite a hollow tone she said 'hello' but on the other side was a grave, sad but melodious voice of Lawrence. If Farhan wouldn't have mentioned probably she could never have been able to identify his voice. Out of excitement she almost screamed. For sometime they talked about each other, Shazia anticipating every moment to hear about Allen but when he didn't mention her she asked and in reply he said in an extremely sad voice' Shazia this world is a maze and at any time you can be caught in it, forever to get stuck in its meshes. And people like Allen are to some extent responsible for it. Can you guess, ... she had always been happily married with two lovely children and so where do I exist in her life?" "Oh God, inconceivable," Shazia whispered to herself and slumped into her chair.

Writer: Associate Professor, Dept. of English, Rajshahi University

রম্য

একজন ইডিয়েট বলছি

একজন রানা

'বিদায়' এই শব্দটা আমার জীবনে লোকাল বাসের মতন। নতুন কিছু নয়। আসা যাওয়ার মাঝে দেখা, কিছু কথা, তারপর ভুলে যাওয়া। তাই 'জীবন অভিধান' হতে 'বিদায়' শব্দটিকে বিদায় করতেই আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। যাকে স্বপ্নে দেখি, কথা বলি, এক সাথে চা খাই, পরের দিন সে আর আমকে চেনে না। অতএব স্মৃতি থেকে তার বিদায়। কী নিষ্ঠুরতা দেখুন তো! বন্ধু মিঠুন, সেও বিদায় নিয়ে চলে গেছে আরেক পৃথিবীতে। আমাকে এক অন্ধকারে ফেলে ওর চলে যাওয়াটা কি খুবই জরুরী ছিল? অর্থাভাবে ভালোবাসাকে কোল্ড-ফ্রিজে রাখতে পারিনি বলে, সে ভালোবাস পঁচে-গলে বুক-ফ্রিজে ছড়ায় গন্ধ। আর চোখের সামনে সে পঁচাগলা ভালোবাসাকে ছিঁড়ে খায় ওপাড়ার শকুনেরা। তবু দু'চোখে দেখতে হয়। জীবনের ভাঁজে কত ক্ষত জমে আছে, দু'চোখে তা দেখতে হয়। নিরস্ত্র এক জীবন যোদ্ধার জীবনের কুরুক্ষেত্রে পরাজয় দেখতে হয়। বইয়ের পাতা হতে জীবন পাতায় যখন চোখ ফেরাই তখন ঘৃণা আর অপমানে 'ইডিপাসের' মত নিজের দুই চোখ নিজেই উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। তুব পরি না। কারণ, আমার চোখে আলোর স্বপ্ন দেখে এক আলোহীন নিষিদ্ধ নারী।

মিঠুন ঘাস-ফুল হতে চেয়েছিল। উফ... যেখানে ঘাসই নেই, সেখানে আবার ফুল। আর আমি? ঢেলে সাজেতে চেয়েছিলাম এই সমাজকে। আমি ঢালতেও পারিনি, সাজাতেরও পারিনি। তাইতো মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে ইঁদুর মারা বিষ ঢুকিয়ে স্মৃতিগুলোকে খুন করতে ইচ্ছে করে, যেমন করে 'ওক' গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুধার অনুভূতিকে খুন করে আফ্রিকার কোকো সম্প্রদায়। ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমঘুম খেলা খেলে লাভ কী? তারচেয়ে একেবারে ঘুমিয়ে গেলে হয় না, কী বলেন? সেক্ষেত্রে লোকাল গাড়ির চেয়ে লেটেস্ট মডেলের মার্সিডিস গাড়ি হলে একটু ভালো। গর্ব করে যাতে সবাই বলতে পরে, 'ব্যাটার নবাবী কপাল'।

জীবনের মানুষের ছুঁড়ে মারা ঘৃণার ঢিল দুই হাতে অনেক বার ঠেকিয়েছি জার্মান গোল-রক্ষক 'অলিভার কানের' মত দক্ষতায়। এখন সে ফর্ম আমার নেই। তাই দয়া করে 'বেকহ্যাম' কিংবা 'রবার্টতো কার্লাসের' দুরন্ত শর্টের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেবেন না, দয়া করে আমার জন্য ঈশ্বরকে একটু বলে কয়ে অন্য জায়গায় যদি... । ও পারবেন না, তাইতো? উপর মহলের সুপারিশ নেই এই জন্য? তাহলে কি গোল খেয়েই বিদায় নিতে হবে? কিন্তু মশাই আমি কিন্তু প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের মত নির্লজ্জ, বেয়াদব এই কথাটা আপনার ঈশ্বর বোধ হয় জানেন না। মোমবাতির মত নিভে যাবার আগেই আরো একবার ধপ করে জ্বলে উঠতে চাই, বোঝা গেল?

আসলে জীবনটা ফুটবল না হয়ে যদি ব্যাট-বল হতো তাহলে বোধ হয় ভালো হতো। অন্তত পায়ের লাথি হতে রেহাই পাওয়া যেত। ছি! ছি! কী প্রাকটিজের ব্যাপার বলুন তো? কিন্তু জীবনটা তো ফুটবল। এদল-ওদল-দু'দল মিলে সব সময় পায়ে পায়ে রাখতে চায়। সত্যি বলতে কী, পৃথিবীটা একটা কলার মত। পাওয়া যাবে না, কিনতে হবে। যে মেয়েটি ভালোবেসে প্রতিজ্ঞা করেছিল-তোমাকে না পেলে বিষ খাবো আজ তার সংসার হয়েছে। শুনেছি, স্বামীকে ছেড়ে থাকতে বললে সে নাকি আজ বিষ খেতে চায় (সৌমিক)। অতএব, ক্ষুধার রাজ্যে ভালোবাসা গন্ধময়। কিছু কি বুঝলেন মশাই? তবে মাত্র নয় হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় মনোরঞ্জন কাকাকে শেষ বয়সে কোমরে কেন পুলিশের দড়ি পড়তে হয়েছিল, তা আজও কেউ বুঝতে পরেছে কী-না আমি জানি না। অথচ দেখেন, এ দেশেই কেউ বা টাকার তোষকের উপর শুয়ে থেকেছে।

আর দেখেছে ফাঁকা স্বপ্ন। জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে পুরোনো শকুন। আবু জাফর সাহেব এ কথা বুঝলেও আমরা আজও বুঝিনা এ কথায় মানে। তো আর কতদিন পদ্মা মেঘনার চোখে জমে থাকবে বিষাক্ত জল, আর কতদিন চোখের মাসনে ঝুলে থাকবে পঁচা ফল আর কতদিন জাতির কলিজা ছিঁড়ে খাবে শকুনের দল। ফলাফল যাইহোক, আমাদের একটা হিসেবের যোগফলতো চাই। কিন্তু 'চিৎকার করে চাই অধিকার/ জানি না আমরা কী দাবিদার/ কোন সভ্যতা প্রজনন করি/ কী আমার দায়ভার' (নচিকেতা)। দায়বার যাই হোক, নিজের অধিকার টুকু আদায় হলেই তো মিটে গেল, তাই না? দুঃখ লাগে। 'দুঃখ যদি না পাবে তো/ দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে' রবি বাবু তুমি বেঁচে থাকলে আর এ দেশে থাকলে এই গান তুমি লিখতে কী না সন্দেহ ছিল। একটু দুঃখজনক ঘটনা জানি। বলবো এবার।

একদিন ঘুম থেকে উঠে রঞ্জিত দেখলো বাবা চিরতরে ঘুমিয়ে গেছে। মনে বড্ড অভিমান ছিলো বাবার। শেষ বয়সে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির সংসারে বড্ড বেমানান ছিলো বুড়োটা। বড় মাছের পেটি খাবার স্বপ্ন দেখে মাঝে মাঝেই ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠতো লোকটা। ব্যাটার স্বপ্নের শ্রী দেখছেন মশাই। ঘরে এক ফোঁটা কেরোসিন জোটে না যায়...। ব্যাটার বিশ্বায়ন মার্কাস্বপ্ন। হাসি পায় শুনলে। তবে আমাদের হাসার আগেই লোকটা মুচকি হাসি হেসে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে আরেক পৃথিবীতে। যে পৃথিবীতে যেতে হলেও নাকি ইদানিং টাকা লাগে মশাই। 'যমালয়ে জীবন্ত মানব' তো তেমনটিই বলে। যাগৃগে। এতক্ষণ অনেক মশকরা করলাম। এবার দু'টো অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা যাক।

যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, টাকা দিয়ে কী হয়? তাহলে আমি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করবো, কী হয় না বলুন তো মশাই? ডিগ্রি হতে শুরু করে আলোবাসা বিক্রি, সবই হয় তবে যা হয়না তা হলো চুরি যাওয়া শৈশবকে ফেরানো যায়না; ফেরোনো যায়না ছেলের ঘুড়ি কেনার স্বপ্নকে, যায় না ভাঙা মানকে জোড়া দেয়া; যায় না হাজার সোনালি শিক্ষা জীবনকে ফিরিয়ে দেয়া, গড়ে দেয় যায়না দারিদ্রের ঝড়ে ভেঙে যাওয়া আমার মাসির সোনার সংসারকে, যায়না ফাঁসির কাষ্ঠ হতে ফেরানো প্রেমের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত আমার প্রিয়তমাকে; যায়না ফিরিয়ে দেয়া মুমিনের দুধের মেয়েকে তার ক্যান্সারে হারিয়ে যাওয়া একমাত্র মাকে; আর যায় না মিঠুনদেরকে ফিরে পাওয়া। তাই আমিও আর ফিরবো না। আর গুণ দা'র তুমি চলে যাচ্ছ কবিতার মত আর বলবো না, তুমি চলে গেছ বলে/ আমার কবিতাগুলো শরবিদ্ধ আহত সিংহের ক্ষোভ বুক নিয়ে/ পড়ে আছে একা/ তুমি চলে গেছ বলে কতগুলো শব্দের চোখে জল'। আর আমার, মানে একজন মরহুম ইডিয়েটের চোখের জলের দামিই বা কতটুকুন? তাই বিদায় বেলার ঈশ্বরের কাছে মিনতি, আর কারো জীবনে যেন এতগুলো বিদায় এক সঙ্গে না ঘটে, একসঙ্গে যেন বুকে জেগে না ওঠে দশ দশটা সাহারা; আর যেন কাউকে লিখতে না হয় এরকম করে কোন ইডিয়েটের আত্ম-কথা।

স্মৃতিচারণ

গুনগুন নিয়ে কথা

কেনা সানা

অভাবের বসন পরা যুবতী জননী, বাবার কাছে সংসারের চাহিদার ফিরিস্তি দিতেন প্রতিদিন। বাবার ভাষায়, তা হলো- অপ্রয়োজনীয় ঘ্যান ঘ্যান। সেই থেকে ঘ্যান ঘ্যান শব্দের সঙ্গে পরিচয়। একটু বড় হলে শুনতাম- মেঘের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ, সাথে বাড়তি আলোর ঝলকানি- বিদ্যুৎ চমকানি। ভয়ে মায়ের আঁচলের নিচে লুকিয়ে যেতাম।

ঘরের পিছনে আমগাছটার ডালে একদিন চোখ আটকে গেল। মৌচাক। দাদী খুশী হলেন। মৌমাছি নাকি যার তার বাড়িতে বাসা বাঁধে না। এ নাকি শুভ লক্ষণ। শুভ কিছু ঘটেছিল কিনা জানি নে, তবে তিনি আমৃত্যু অভাবের সাথে বসবাস করেছেন। সেখানেই প্রথম গুনগুনের শব্দ তরঙ্গের সাথে পরিচয়। পদার্থ বিজ্ঞানের নবীন ছাত্র। কম্পন নিয়ে তাজা জ্ঞান। শিক্ষকের সহায়তায় শিখলাম- মৌমাছির পাখার বারবার ঝাপটানিতে গুনগুন শব্দ। হারমনিয়াম তখন চোখেও দেখা হয়নি। দেখলেও যে খুব বেশি লাভ হত, মনে হয় না। তাল-লয়ের জ্ঞান তখনও ছিল শূন্য।

স্কুল জীবনে সহপাঠী বান্ধবীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গুনগুন করে কবিতা আওড়াতাম, কখনও কখনও তা গানের পর্যায়ে পৌঁছাত। তাতে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল কিনা জানি না, তবে প্রেম আর পরিণয় যে ঘটেনি এটা নিশ্চিত। এখন সে ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। কলেজ জীবনে হোস্টেলের অভিজ্ঞতা সবারই আছে। বাথরুমে গুনগুন করে গান গাওয়াটা অবশ্য দু'টি কারণে। প্রথমত, বাথরুমের দরজার সিটকিনি ছিল না ফলে যাতে অন্য কেউ অতর্কিতে ঢুকে পড়তে না পারে। আর অপরিষ্কার বাথরুমে দুর্গন্ধ দূর করার জন্য। আমার হেড়ে গলার গুনগুন সুরে গান, আর কিছু না হোক সে গান শুনে দুর্গন্ধ যে পালাতো তা বেশ আঁচ করতে পারতাম।

অনেক বছর পর সেই পুরোনো সহপাঠী সাথে দেখা। সাথে তার স্বামী আর দু'সন্তান। আর আমার সাথে স্ত্রী ও সন্তানেরা। রবি ঠাকুরের 'হঠাৎ দেখা'র মত রেলগাড়িতে নয়, ক্ষুদ্র আকারের বাসের মধ্যে। সামান্য কথা- হায়, হ্যালো পর্যায়ের। অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম। তার স্বামীর কৌতুহলী চোখ আর আমার স্ত্রীর শীতল- নিরুত্তাপ আচরণ, শীতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়ও আমাকে ঘামিয়ে তুলল। একবার গুনগুন করে গান গাইতে ইচ্ছে করল পুরোনো দিনের মতো। কিন্তু স্ত্রীর কঠিন হাতের স্পর্শ, আমার গলায় পাথরের জড়তা এনে দিল। আমি মনে মনে আওড়ালাম-'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'।

আমার এক চিঠির প্রেক্ষিতে আমার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অনুজ একদিন 'গুনগুন' নামে একটি প্রত্রিকা বের করল। আশ্চর্য না হলেও অবাক হলাম। ভাতের জ্বর মাপার জন্য যে ভাতের হাড়ির মধ্যে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেয়, সেই কিনা বের করবে পত্রিকা? কয়েকটি সংখ্যা বের হয়েই বন্ধ হয়ে গেল। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নাকি তাদের শাসিয়ে দেয়া হল। ভয় দেখানো হল- বেশি গুনগুন করলে মৌমাছির হুল ফুঁটিয়ে দেয়া হবে। আর্থিক অসঙ্গতি আর বাহ্যিক হুমকি ধামকিতে একদিন সে উদ্যোগ নিভে গেল।

অনুজ আমার এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার, বড় বড় ছাত্র-ছাত্রী পড়ায়। আমার ছোট কন্যা প্রায়ই হাসতে হাসতে বলে- জানো বাবা, ছোট চাচুকে তার ছাত্র-ছাত্রীরা মানেই না, সে টিচার হবে কেমন করে, ছোট্ট মানুষ। ওর কাছে ওর ছোট চাচু ছোট্টটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে কেমনে। 'গুনগুন' বের হওয়ার পরে বলেছিলাম- শিরোনামটা 'লাঙলের ফলা' হলে ভাল হত। আমরা সবাই

এখন শুকনো, শক্ত, অনুর্বর ভূমিতে বসে আছি। এখানে ফসলের সমারোহ নেই। কেউ সাহিত্য নিয়ে ভাবে না, চিত্রকলা সেতো অনেক দূর। আমাদেরকে লাঙলের ফলায় উলোট-পালোট করতে হবে সব, করতে হবে চাষ, ঢালতে হবে জল, তবেই না ফসল, তবেই না আমাদের ভবিষ্যৎ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে আমাদের প্রয়োজন তাই শুভ উদ্যোগ।

অনুজের কণ্ঠে অভিমানের সুর। সে গুনগুন করে যাবে, যদি সে মিছিলে কেউ শামিল হয় ভাল; না হলে হাওয়ায় মিলে যাবে সব আয়েজন, সব প্রচেষ্টা। গুনগুন করে যে সুর, তা কারও ভাল লাগলে ভাল, না হলে সে সুর মৌমাছির হুলে পরিণত হবে। সমাজের অসঙ্গতি দূর করতে একতালে চলার চেষ্টা, একই সুরে গান গাওয়া। না হলে- সমালোচনার বানে জর্জরিত করার প্রচেষ্টা।

কয়েকদিন আগে বাড়িতে গেলাম। তখন সে আমার পাশে। তার অনুপস্থিতিতে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গুনগুনের উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠান হল। ফেসবুকে ছবি। তাকে খুব উৎফুল্ল দেখাল। তার উজ্জ্বল মুখে আমি পরিতৃপ্তির রক্তিম আভা লক্ষ্য করলাম। বলেই ফেললো, দেখ ভাইয়া আমার গুনগুন বড় হয়েছে, আমার উপর নির্ভরশীল নয়। 'গুনগুন' এর শ্রীবৃদ্ধি হোক, জীর্ণ সমাজটাকে টেনে হিঁচড়ে সামনে এগিয়ে নেয়ার এ উদ্যোগ সার্থক হোক- এই শুভ কামনা।

পরিচ্ছন্ন ও স্বাদে বৈচিত্র্যময় রেস্তোরাঁ

আর.কে. রোড (ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের সামনে), ধাপ, রংপুর।

ফোন : ০৫২১-৫৪৬৭৪, মোবাইল : ০১১৯১-৪০৫২১৪, ০১৭১৫-৭৭১৮০৬

E-mail: kasturirestora@yahoo.com

শিশু পাতা

স্বপ্ন

সুমন্তা সায়রী শ্রেয়া

অফিসের কাজে জাহিদ আহমেদ বান্দরবান যাচ্ছেন। সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত শরীরে বিকেলে রওনা হয়েছেন, সঙ্গে ড্রাইভার কুদ্দুস মিয়া। অনেক শহর, গ্রাম, বন্দর, নদী, খাল পার দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়। ড্রাইভার জানায়, আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে।

তারা যখন কেরানীর হাট ছেড়ে পাহাড়ি পথে সামনে এগুচ্ছিল ঠিক তখনই তাদের গাড়ি নষ্ট হলো। কী আর করা! জাহিদ আহমেদ তার ড্রাইভারকে বললেন, গাড়ি ঠিক করার জন্য কাউকে ডেকে আনতে। কিন্তু জাহিদ আহমেদের ড্রাইভারটি একটু ভীতু প্রকৃতির। সে এই নির্জন অন্ধকার জায়গায় কিছুতেইএকা কোথাও যেতে চাইছিল না। তাই জাহিদ আমহেদকেও সাথে যেতে হলো। গাড়ি থেকে নেমে তারা যখন হাঁটতে শুরু করলো, ঠিক তখন শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। তারা দু'জন পাহাড়ের কোলে একটি বাড়ি দেখতে পেয়ে সেখানেই গিয়ে দাঁড়ালেন। বাড়ির দরজায় টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে একজন দরজা খুলে দিলেন। খুব যত্নের সাথে তাদেরকে ভেতরে ঢোকালেন। জাহিদ আহমেদ মানুষটিকে সব কথা খুলে বললেন। জাহিদ আহমেদ এর কথা শুনে লোকটি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এত রাতে এখানে গাড়ি ঠিক করার লোক পাওয়া যাবে না বরং আজ রাতটি আপনারা আমার বাড়িতে থাকুন। কাল সকালে আমি লোক এনে গাড়ি ঠিক করে দিব। জাহিদ আহমেদ উপায় না দেখে তাই করলেন। রাতে খাওয়া শেষ করে তারা কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে যে যার ঘরে শুয়ে পড়লেন।

রাতে জাহিদ আহমেদ, সেই লোকটিকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি দেখলেন, লোকটি তার ড্রাইভারে প্রতি অমানুবিক অত্যাচার করছেন এবং শেষ পর্যন্ত তার একটি হাত কেটে ফেললেন। প্রচণ্ড ভয়ে জাহিদ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। এর পর এক লাফে বিছানায় উঠে বসলেন। চোখ খুলে তাকাতেই দেখলেন তার সামনে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। এরপর লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

তখন জাহিদ আহমেদ বললেন 'আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। এ কথা শুনে লোকটি খিলখিল করে হেসে উঠল এবং পেছন থেকে একটা কাটা হাত এনে বলল, আপনি নিশ্চয়ই এটি দেখেছেন। জাহিদ আহমেদ ভয়ে চিৎকার করে নিচে বসে পড়লেন। কিন্তু লোকটি অনবরত তাকে ডেকে যেতে লাগল। তখন জাহিদ আহমেদ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, লোকটি তাকে স্যার, স্যার বলে ডাকছে।
ঠিক যখন চোখ মেলে তাকালেন জাহিদ আহমেদ এবং দেখলেন তার ড্রাইভার তাকে দেখে হাসিমুখে বলল, স্যার আমরা পৌঁছে গেছি। আপনি ঘুমিয়েছিলেন তার আমি সেই কখন থেকে আপনাকে ডাকছি' এপর জাহিদ আহমেদ বুঝতে পারলেন তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন।

লেখক : শিক্ষার্থী, ৭ম শ্রেণী, টিএমএসএসসিআর

আকাশ ও মেঘ

প্রজ্ঞা সিদ্দীক

আকাশ মেঘে ঢাকা। চারিদিক থমথমে। হঠাৎ টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, কিছুক্ষণ পরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। কী অদ্ভুত! হাঁসগুলো মহা-আনন্দে পুকুরে নেমে গেল। প্যাকপ্যাক শব্দে আনন্দের গীত ধরলো। আমারও ইচ্ছে হল বৃষ্টিতে ভিজি। কিন্তু ইচ্ছেটাকে মনের মধ্যেই রেখে দিলাম, প্রকাশ করতে মানা। বৃষ্টি আমার তেমন পছন্দ না। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি হলে, কেন জানি না মন ভালো হয়ে যায়। তখন বৃষ্টির নুপুর পায়ে ঝমঝম নাচ আমার বেশ লাগে। আলসেমীর জন্য আর লেখা পড়ায় তেমন গা নেই। বৃষ্টি যেমন ঝমঝম করে শুরু হয়েছিল তেমনি আবার দ্রুত থেমেও গেল। লেখার উপকরণ খোঁজা। বৃষ্টি পড়াতে ভেবেছিলাম বৃষ্টি নিয়েই লিখব। কিন্তু বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় ভাবছি কী নিয়ে লিখব ? হঠাৎ করেই রোদের দেখা। চড়চড় করে রোদ বাড়ছে। হাঁসগুলো এখনো পুকুরে প্যাক প্যাক করছে। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় তাদের আনন্দে খুব যে কমতি তা মনে হল না। বারান্দায় কয়েকটা শালিক পাখি ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে ঝগড়া করছে। কিচির মিচির শব্দে তাদের ঝগড়া চলছে। কি নিয়ে ঝগড়া চলছে বুঝতে না পারলেও ঝগড়া যে চলছে তা বুঝতে পারছি। কয়েকটা কাক কা কা করে উড়ে গেল খাবারের সন্ধানে। কোকিলের কুহু ডাক এখন অনেক কমে গেছে। কদিন পরে আর হয়তো ডাকবেই না। কিন্তু হঠাৎ কী হল জানি না, একটা কোকিল কোথায় জানি বসে কুহু কুহু করে ডাকা শুরু করে দিল, হয়ত আমার কথার জবাব দেয়ার জন্যই তার জানান দেওয়া। রাস্তায় কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। তাদের সুখ দুঃখের গল্প বলছে বলেই মনে হল। কিচ মিচ করে নাম না জানা আরও কয়েকটা পাখি ডেকে উঠল। কী জানি কী বলছে। প্রকৃতির এমন প্রাণবন্ত নানা আয়োজনের মাঝে বাঁধ সাধবার জন্য আমরাই যথেষ্ট। সম্ভবত মেঘের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ অথবা বৃষ্টির রিমঝিম গান দূরে কোথাও হারিয়ে ফেলতে পালেই আমাদের ষোল কলা পূর্ণ হয়।

প্রকৃতির নিরাপত্তার দায় কেবল মানুষের!

লেখক : শিক্ষার্থী, ৮ম শ্রেণী, পটুয়াখালি সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বসন্ত ও আমি

মোঃ মোরশেদ হোসেন*

বসন্ত কি চিরন্তন?
মানুষের মনে, প্রকৃতিতে
নাকি বদলে যায় নানা প্রভাবকে?
মানুষের মনই কি বসন্ত?
আনন্দ, বেদনা, যুদ্ধ, বন্যা, খরা কি বসন্তকে বদলে দেয়?
প্রতি বসন্তেইতো ফুল ফোঁটে, পাখি গায়
হলুদ শাড়ি পরে রমনীরা, বরণ হয় সাড়ম্বরে
প্রকৃতিতে লাগে রং, কবিরা লেখে কবিতা
তবে আমার মনে আজ বসন্ত নেই কেন?
সেখানে আজ কিসের অস্থিরতা?

(বিশ্ববিদ্যালয়ে বসন্ত বরণ উদ্‌যাপনে আগ্রহী শিক্ষক জনাব আপেল মাহমুদকে উৎসর্গ)

** ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর*

লিমেরিক

মোহাম্মদ শাহ আলম

১
তুমি যখন জোসনা বলো, মেঘ বলি আমি
সুখের সূর্য তুমি দেখ, আমার দুঃখ জামি।
নিত্য-নতুন সাজাও তুমি সুখের বালাখানা
দুঃখ ঘেরা জীবন আমার নিত্য চেনা জানা।
মিছে মিছি সাম্যকথা, যাচ্ছে জীবন থামি।

২
মুখে বলি আমি সবার জন্যে
সাজাই জীবন হরেক রকম পণ্যে
বাঁচো কিংবা মর নেইক আমার দায়
জীবন আমার সুখেই কেটে যায়
গড়ব প্রাসাদ আমি, তুমি যাও অরণ্যে।

৩
ভাঙে নদী ভাঙে জীবন
যায় দূরে যায় সুখের স্বপন
দেয়না কেউ তো আশা
সবাই স্বপ্ন নাশা
তবু করি সুখের স্বপ্ন বপন।

কবি : বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর

অমর হবে তুমি

মোঃ ফেরদৌস রহমান

তোমার কলম একদিন থেমে যাবে,
সে দিন তুমি আর কাব্য রচনা করতে পারবে না;
তোমার ছন্দ একদিন হারিয়ে যাবে,
সে দিন তুমি আর কবিতা লিখতে পারবে না;
তোমার কণ্ঠ একদিন থেমে যাবে,
সে দিন তুমি আর গাইতে পারবে না;
তোমার চোখ একদিন অন্ধ হয়ে যাবে,
সে দিন তুমি আর পৃথিবীর আলো দেখতে পারবে না;
তোমার স্মৃতি একদিন হারিয়ে যাবে,
সে দিন তুমি আর পুরনো কিছু মনে করতে পারবে না;
তোমার অঙ্গ একদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে,
সে দিন তুমি আর চলতে পারবে না;
তোমার ক্ষমতা একদিন অন্যের হাতে চলে যাবে,
সে দিন তুমি আর কাউকে আদেশ করতে পারবে না;
তোমার যৌবন একদিন শেষ হয়ে যাবে,
সে দিন তুমি আর রক্তের তেজ দেখাতে পারবে না;
তোমার চেহারার লাবণ্য একদিন কমে যাবে,
সে দিন তুমি আর সুন্দর যুবতীর মন কেড়ে নিতে পারবে না;
সে দিন তুমি কেড়ে নিতে পার মরণের হাতছানি।
সে দিন তুমি এ পৃথিবীতে না থাকলেও
থেকে যাবে রেখে যাওয়া কর্মগুলি।
যদি সেগুলো মানুষের কল্যাণকর হয়, তবে মরণের পরেও
অমর হবে তুমি।

কবি : বিভাগীয় প্রধান, মার্কেটিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

মানুষ এখনো আদিম

তুহিন ওয়াদুদ

পৃথিবীর যাচ্ছেতাই মানুষেরা মেরুদণ্ড রেখেছে খুলে,
স্বার্থচিন্তার ঘুণ পোকায় খেয়েছে মনন-শরীর,
কেঁচোর মত কিলবিল করে ভেতরের মানুষটি।

ক্ষমতার কাছে নিবেদিত হওয়াই পূণ্যজ্ঞান!
আলোক-কণা নিমিষেই মুছে যায় ,
আলোকিত মানুষের অন্ধ হওয়ার ইতিহাস রচিত হয় আরও একবার।

সভ্যতার নামে দ্বিপদী প্রাণি এখনো বন্য
নদী-বৃক্ষ সব কিছু উঠে এসেছে দ্বিপদীর খাওয়ার টেবিলে ।
ধর্মমত, ব্যক্তিমত কিংবা পুঁজিমত আমাদের সম্পদ।

সর্বমত, সাম্যমত, মুক্তমত অক্ষরে অক্ষরে রচিত শিল্প।
দাসত্বের দম্ভ
নিয়তির গর্বিত তিলকরেখা !
সনদের অন্তঃসার শূন্যতা
জাতির বুকে এঁকে দেয় মূর্খতার বর্বরতা।

মানুষ এখনো আদিম।

কবি : শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

দূরত্ব

রিবিণ পরিমল

দূরে থাকা ভাল, দৃষ্টির আড়ালে থাকা যায়,
গন্ধ-বর্ণ পাখা মেলে
স্পর্শাতীত দীর্ঘ হয়
উড়িবারে চায়
দীর্ঘ দীর্ঘ উড়ালের শেষে অবশেষে ডুবে থাকে;
দূরত্বে অন্তত মন মজেনা দুর্বিপাকে।

কত দূরে থাকতে পারে মানুষ আপনারে ছেড়ে-
একাকী বিস্ময়ে ভাসি এমত ভাবনা স্রোতে,
কতটা অরূপ মিশে থাকে রূপের আধারে
খুঁজি না তার সীমানা আর কালের প্রপাতে।

তবু আমি দূরে থাকি, দূরত্বের টানে-
যদিবা একসুর সাধে সবে মিলনের গানে।

কবি : সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

তবুও নৈঃশব্দ্যের হা

বিমলেন্দু রায়

বড় বড় অট্টালিকা
শ্রমিকের ঘাম
তবুও নৈঃশব্দ্যের হা
শব্দকে পোড়ায়
জীবাশ্মে জীবনের সাধ
অকস্মাৎ তুষারপাত
কসাইখানায় শ্বেত ভল্লুক
নখর আঁচড়ায়
রহস্যের জাল বোনে মেরুর বাতাস।

সারা বেলা কালবেলা
বেলা অবেলায় কালঘাম
তবুও কালের কপাল নিরুদ্বেগ নিষ্প্রাণ
শুধু দৈনিকের পাতা ভারী হয়
ঘামে ভেজে ইতিবৃত্তের ইতিহাস
ক্যারাত মমীরা আচমকা জেগে ওঠে
নিঃসঙ্গতা ঘিরে রাখে প্রাগৈতিহাসিক
পিশাচের দল
পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য
আবারো দেখার সাধ ইবনে বতুতার।

কবি : লেখক ও কবি

ফুরিয়ে যাচ্ছে মানবিক সভ্যতার আলোটুকু

জাকিয়া সুলতানা চৈতী

ফুরিয়ে যাচ্ছে মানবিক সভ্যতার আলোটুকু!
সময় গড়ায় সীমাহীন ভাবে
সময়কে হাওয়ায় মুড়ে
হেঁটে যাচ্ছে দেখ-
চেনা মুখ
চেনা সুর
চেনা পাঠ
অনন্ত আশা উড়ছে
উল্টো হাওয়ায়-
চোখে তোমার; আমার স্বপ্নের ক্রন্দন
অজস্র বছর গত হল
পৃথিবীর মাটিতে
সময় গড়ায় সীমাহীন ভাবে
কিছুই থেমে নেই
কেবল ফুরিয়ে যায়, যাচ্ছে থেকে থেকে
মানবিক সভ্যতার আলোটুকু।

কবি : আইনজীবী, লেখক ও কবি

বৈশাখী মেলা

শিরিন আক্তার

দূরে ঐ দূরে দেখা যায় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য
দেখা যায় কয়েকটি মানুষ, ভিটা-ডাংগায়
ছোটাছুটি, বাতাসা-খই-দই আহারে মত্ত
বাঙালি পথিক।
আলতা, সাবান, আয়না, চিরুনি, স্নো
কত রং-বেরঙের বাঙালি নারী
চোখ জুড়ায়, মন ভুলায়
দেখে সব, নাগর দোলা, সার্কাস
প্রভৃতি আনন্দ আয়োজনে।
প্যাঁচানো গুড়ের জিলাপী আর মাটির
ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ায় মন বাঙালি ঐতিহ্যে
কত স্বজন আসে, কত আপন জন
ভিড় করে মেলাকে ঘিরে,
দুপুর, বিকাল, গোধূলি শেষে
মেলার আসর নিঃস্বতায় হয় সমাপ্ত।

কবি : শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

সময়ের বাতাবরণ

কায়সার আলম

মানবিকতা খুইয়ে ঘুনপোকা হয়ে যাচ্ছে হৃদয়,
মস্তিষ্কের দোলাচলে নড়বড়ে বিবেক!
মানুষের যান্ত্রিক হয়ে হয়ে যাওয়া দেখে
দাঁত খামচি মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় স্মৃতি আর বিস্মৃতি ...

কি এক অর্থহীন বিস্ময় এসেছে আচমকাই,
পুঁজিপতি হয়ে গেছে সর্বভুক!
হাঙরের জাত হয়ে যাওয়া দেখে দেবতা কাতর,
মানব জন্ম কোন দিন দেখে নাই এ জাতের পশু!

যুদ্ধ চাই, রক্ত চাই, ধ্বংস চাই বলে আজ
মানুষকে পশু হওয়া দেখে পশুত্বের অপমান...
ব্যধিগ্রস্থ চেতনার কাছে চেতনার সুস্থতা জিম্মি,
মানুষ কোন কালেও মানব ছিলো না বুঝি!

অন্ধকার ছাপিয়ে গেছে ঘন পৃথিবীর আলোক রেখা,
অরণ্য প্রধান বৃক্ষটি গোগ্রাসে খেয়ে নিয়েছে দুর্বল শূকরকীট,
আদিমতা থেকে ফিরে এসে রক্তের ঘ্রাণ পেলেই
মানুষকে পশু হতে দেখা গেল!

স্রষ্টার সৃষ্টিতে ভুল মেনে নিয়ে সশ্রদ্ধ শির,
গ্রন্থিত স্বরলিপির মহাপ্রলয়ের অপেক্ষায় ...

কবি : শিক্ষার্থী, মার্কেটিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

পাওয়া যাচ্ছে

বিসিএস, ব্যাংক, নিবন্ধন সহ যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্রুত প্রস্তুতির কৌশল সম্বলিত বই ...

ENGLISH SOS

for

Job

With Basic Grammar

প্রাপ্তিস্থান: দেশের সকল অভিজাত লাইব্রেরী
প্রয়োজনে: ০১৭১৪৮০২৭৬২, ০১৭৩৭১৫৩৪৩৭

রচনা ও সম্পাদনায়:
মোঃ এরশাদুল হক খন্দকার
বি. এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)

স্তব্ধতা

মোঃ হামিদুল ইসলাম

বড় ব্যথা লাগে যখন দেখি ক্ষুধিতের আর্ত চিৎকার।
তার চেয়ে কষ্ট পাই যখন দুবর্লকে করে ফুৎকার।
খারাপ লাগে গণতন্ত্রের বেহাল দশা দেখে
দেশকে নিয়ে ভাবে না তারা সংসদে থেকে।
অপরাধীরাই চক্ষু সমাজে হুংকার মেরে ডাকে,
টাকার রাজ্যে ঘুমায় তারা তৈল দিয়ে নাকে।
শ্রমিকের ঘরে জ্বলে নাকো তেলের অভাবে বাতি,
ধনবানের ঘরে জ্বলছে আলো, চলছে দিবা রাতি।
আত্মা আজ হাফসিয়ে কাঁদে ন্যায় বিচার পেতে,
টাকার অভাবে হয় নাকো জামিন, শ্রী ঘরে হয় যেতে।
অপরাধ ঘটলেই রাজনৈতিক দল করেন রেষারেষি,
ক্ষমতার বলে অপরাধী থাকে মূলত ছদ্মবেশী।
দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার দায়িত্ব নেন যারা,
দুর্নীতির দায়ে অপরাধী হয়ে শীর্ষে থাকেন তারা।
যোগ্যকে আজ যোগ্য জায়গায় দিচ্ছে না কেউ ঠাঁই,
পর্দার অন্তরালে ভদ্র মহোদয়গণ ইচ্ছে মতো চাকুরী বিলায়।
মানুষ বানানোর কারিগর হিসাবে নিয়োজিত থাকেন যারা,
যোগ্য ও দক্ষ না হলে কি শিখাবেন তারা।
কতকাল আর এরূপ ঘটবে দুনিয়া জানে না আজ
উঠবে কবে তাদের মাথায় স্বচ্ছলতার তাজ।
মানবতা আজ লিপিবদ্ধ শুধুই বইয়ের পাতায়,
মনুষত্ব আজ পিষ্ট সবার রোলার মেশিনের যাতায়।
ন্যায় বিচার করতে গেলে পকেট থাকে ফাঁকা,
ব্যক্তিগত থাকেনা গাড়ি, ঘোরে না চার চাকা।
মনুষত্ব আজ বিলীন হয়েছে অচিন গহ্বরে,
ভাগ্য আজ শুধুই প্রসন্ন হয় উঁচু লবিং করে।
এরই নাম কি সুশীল সমাজ ভদ্রতার নেই ছাপ,
গুরুতর ভুল করেও এখন অপরাধী পাচ্ছে মাফ।
শেষ হয় নাকো তবু তাদের অর্থলিপ্সার লালা,
স্তব্ধ হই দেখে তাদের রাজনৈতিক চাল-চালা।

কবি : শিক্ষার্থী, মার্কেটিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

বৈশাখী বিকেল

আহমেদ বুলবুল

ক্যালেন্ডারের শেষ পাতাটা নিঃস্ব,
দ্বারে দ্বারে ফেরে নতুনের আহ্বানে।
সূচনা নতুনের,
নতুন দুপুরের
নূতন বিকালের,
নতুন কোন চেতনার।
বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রণহীন
তবু জাগে আশা চড়কহাটির
পথে পড়ন্ত বিকালে
আসন্ন গোধূলির রাস্তায়।
আশা জাগে দোলার মাঝে
বটগাছের তলায় খুঁটি টাঙানো
ঘোড়া পুতুলের দোকানে
আরও আশা জাগে খাঁটি গুড়ের
মুড়কিটুকু খেতে,
ও নাগর দোলায়-ঘুরপাক করতে,
আকাশে চলন্ত রাঙ্গা ঘুড়িটার
দড়িটাও টানতে কত যে আশা জাগে
আশা জাগে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বাবার সাথে
হালখাতার লুচি-পরোটা, সুজি-গোল্লা খেতে,
তারপরে ক্লান্ত হয়ে রৌদ্র হতে ফিরে
একটু ছায়া খুঁজতে
ছায়ায় বসে একটু পানি পান করতে
কলা, ছাতু, গুড়, আর পেঁপের শরবত খেতে
এসব আশা জাগে বৈশাখের বিকালে।

কবি : শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

নীরব অপেক্ষা

সাদিয়া কাওছার

তোমার শান্ত স্থবির নয়নের অস্থিরতা
আমার গভীর অস্থিরতাকে আরও অস্থির করে তোলে।
তোমার নীরব দৃষ্টির শূন্যতায়
আমার দৃষ্টির দিগন্ত যায় আরও বেড়ে।
তোমার নিস্তব্ধ চাহনীর উদারতা
আমার ভেতরটা ওলট-পালট করে।
তোমার অসহায় মায়াবী চোখ দুটো
আমর স্বপ্ন গড়ার কারখানাকে সচল করে।
তোমকে জয় করব বলে
তোমার কাঠিন্যকে ভেদ করব বলে
তোমার ভরা স্বপ্নের সাথী হব বলে
আমার এই নীরব ভালবাসা।
তোমার জন্য আমার সকল স্বপ্ন আশা
তোমার জন্য আমার সুপ্ত হৃদয়ের জেগে থাকা
তোমার জন্য অস্থির পাগলপারা
তোমার জন্য আমার এমন নীরব থাকা
তবু তোমার জন্য নয় আমার এ পথচলা।
যে তুমি আজ হারিয়ে গেছ অন্ধ কারাগারে
যে তুমি আমার আবিষ্কার
যে তুমি আমার মাঝে স্বপ্ন জাগিয়েছিলে
আজ সে তুমি নেই।
আজ তোমার মাঝে আমার সেই স্বপ্ন বালককে খুঁজে পাইনা
তবু আমার সেই স্বপ্ন কুমারকে ভালবেসে যাব
তার মঙ্গল কামনায় আজো
প্রার্থনা আর প্রতীক্ষা।

কবি : শিক্ষার্থী, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আমি

মোঃ সোহানুল হক

সামান্যই বালক আমি
আলোকময় আগামীর পথে
চেয়ে থাকা বহুদিন।
আকাশের নরম তুলো মেঘে
খেলা করে আমার স্বপ্নগুলো
সহসা এক ঈগল কঠিন থাবায় গেঁথে
শূন্যের দিকে আমার লক্ষ্য নিয়ে ওড়ে
বাহিত হয় অজানা উজ্জ্বল আলোয়
ধাবিত হয় অচেনা আকাশে
তোমার ঝাপসা চোখে অচেনা বালক দেখে
ভারি স্বপ্ন কাঁধে নিয়ে অসম্ভব ভরহীন পায়ে
পাড়ি দিচ্ছে খুঁটিবিহীন সাঁকো।

কবি : শিক্ষার্থী, মার্কেটিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

ঘুড়ি

মোঃ খোরশেদ আলম

মিষ্টি বিকেলের হালকা বাতাসে
একটু একটু করে উর্ধাকাশে
নাটাইয়ের সুঁতোয়
উড়েছিল আমার সখের ঘুড়ি।
ডানা মেলে ভাসছিল,
কখনো দোল খেয়ে নাচ ছিল-
হঠাৎ দমকা বাতাসে
সারা শরীরে জাগায় শিহরণ-
সুঁতো গেছে ছিঁড়ে,
ঘুড়ি নেই কোন খানে।
এদিক-ওদিক, চারিদিকে ছুঁটি,
না পেয়ে ঘুড়ি কাঁদি লুটোপুটি,
সেই নাটাই খানা ধরে
আজো ঘুরি সেই ঘুড়ির সন্ধানে-
রঙিন কাগজে গড়া, আমার সখের ঘুড়ি।

কবি : শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

অসমাপ্ত গল্প

সুমন রহমান

সেই দিন সন্ধ্যায় শরতের মায়াবী চাঁদ
উঠেছিল দিগন্তের বাঁকে
কোন এক রহস্যময়ী নারীর মত
সেজেছিল রাত
তারার আল্পনায়।
অসীম মুগ্ধতা নিয়ে আমি তাকিয়ে ছিলাম
সেই কৃষ্ণা-দ্বাদশীর দিকে
ভেবেছিলাম যদি এমন মুহূর্তগুলি
কখনো শেষ না হতো।
আমাদের জীবনের ছোট ছোট গল্প আর স্বপ্নগুলো
যদি কখনোও ব্যর্থ না হতো
তবে কোন এক জ্যোৎস্নার রাতে, তোমার
হাতের পরে হাত রেখে বলতাম ভালোবাসি।
এখন আমার শরৎ চলে গিয়ে আসে বসন্ত
জ্যোৎস্নায়-বৃষ্টিতে ভিজে একা একা
তবুও হয় না কখনো তোমাতে আমাতে
এক মুহূর্তের দেখা
হয়না কখনো নক্ষত্র পতন।
চলে যায় নক্ষত্রের রাত।
এমনি করে আমাদের জীবনের প্রিয় কিছু কথা
হয় না কখনও ব্যক্ত
থেকে যায় যত স্বপ্নগুলো শ্রান্তিতে অসমাপ্ত।

কবি : শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

নীল কুয়াশার ঘোমটা

মোঃ শাফিউল ইসলাম পলাশ

তোমার জলেই তো ভরে আছে দুই চোখ
অযথা আমার চোখের অশ্রু নিয়ে
কেনই বা ঝরাবে তুমি
প্রচণ্ড ভালোবাস বলে?
কেনই বা ভালোবাসবে আমায়
আমাকে কখনো ভালোবেসো না
ভালোবেসে তোমার চোখের কোণে
আমার চোখের অশ্রু মেখে নিওনা।
তাহলে ভেঙে যাবে তোমার অশ্রুমালা
ঝরে পড়বে ছোট ছোট কাঁচফুল
ওখানে জন্ম নেবে বেদনার শেকড়
হয়তোবা তখন তোমার ভালোবাসা
হয়ে যাবে অশ্রু সাজানো নীল কুয়াশার ঘোমটা।
কিংবা হয়ে যাবে কাঁচফুলের নির্বাক সমাধি।

কবি : শিক্ষার্থী, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

তুমি ভাবলে কি করে

মোঃ রাফিউল ইসলাম

তুমি ভাবলে কি করে
আমি তোমার কৃতদাস হয়ে থাকবো
তুমি ভাবলে কি করে
আমি তোমার ডাকেই ছুঁটে যাব
তুমি ভাবলে কি করে
আমি তোমার জন্য জীবন বাজি ধরব
তুমি ভাবলে কি করে
আমি তোমার জন্য কাঁটামাখা পথে হাঁটতে থাকবো
তুমি ভাবলে কি করে
আমি তোমার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেব
তুমি ভাবলে কি করে
আমি তোমার জন্য নিজেকে জ্বালিয়ে কাবাব বানাবো
আমি এসবের কিছুই করব না
কারণ ভালোবাসা মানুষকে
উদার করে কৃতদাস নয়।

কবি : শিক্ষার্থী, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

গুনগুন পরিবার

নির্বাহী কমিটিঃ

উমর ফারুক, সভাপতি

আফিফা ইশরত চেতনা, সাধারণ সম্পাদক

আবু হুরাইরা রাকিব, সাহিত্য সম্পাদক
তানজিমা হক, অর্থ সম্পাদক
বিভূতী ভূষণ মাহাতো, প্রচার সম্পাদক
মোঃ সোহানুল হক, ক্রীড়া সম্পাদক
মোঃ তৌহিদ নূর শাফি, সদস্য
আন্নানা আকতার জাহান, সদস্য

সাধারণ সদস্যঃ

উমর ফারুক
আফিফা ইশরত চেতনা
আবু হুরাইরা রাকিব
তানজিমা হক
বিভূতী ভূষণ মাহাতো
মোঃ সোহানুল হক
মোঃ তৌহিদ নূর শাফি
আন্নানা আকতার জাহান
মোঃ ফরিদুল ইসলাম সোহাগ
আব্দুল পকুর তপু
এলিজা হক লিজা
স্নিগ্ধা আক্তার
ইশরাত জাহান
মোঃ জাকির হোসেন
মোঃ সেলিম হোসেন
টুম্পা সরকার
মোঃ রোকুনুজ্জামান লিখন
আতিকুর রহমান বসুনিয়া
পল্লব মিনজ্
অনন্যা চক্রবর্তী তমা
মোঃ শাফিউল ইসলাম পলাশ
মোঃ মোরশেদুল হাসান আরিফ
সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ
মোঃ সালাহউদ্দিন
মোবারক হোসেন রানা
মোঃ ইবনুল তাশরিফ
রোকুনুজ্জামান রনি
শারমিন আক্তার ছন্দা
শাম্মি বিন্তে ছারওয়ার বৃষ্টি
উজ্জল পাহান

আগামীর প্রেরণা

"S@ifur's হল ইংলিশের Boss, এখানে কোচিং করলে নেই কোন Loss!"

Spoken, Writing, Phonetics, IELTS, MBA ও Bank Job সহ BCS কোর্স চলছে।

ছোট্ট যে ভুলটির কারণে ভাল ভাল চাকুরিগুলি হাত ফসকে বেরিয়ে যায়-

"ভুলটা হল অনার্স পরীক্ষা দিয়ে MBA -র জন্য try না করা। বন্ধুদের মধ্যে যারা IBA -র MBA ও DU -র EMBA -সহ ভাল জায়গায় MBA -তে চান্স পেয়েছিল তারা এখন সব্বাই Multinational কোম্পানীতে ভাল বেতনে চাকরি করছে। আর আমি কিনা ....."

এমনকি চাকুরী পেতেও MBA কোচিং জরুরী!

মজার ব্যাপার হল বেশিরভাগ Bank ও Multinational কোম্পানীতে Job-এর written test হয় MBA - পরীক্ষার আদলে। তাই MBA কোচিং করলে MBA-তে ভর্তি ও Job-এর Preparation এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ।

S@ifur's-রংপুর ব্রাঞ্চ

ঢাকা হোটেলের গলি, জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর।

01713432023

রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে নিভৃত নিলয়ে প্লট বরাদ্দ চলছে

এখনই বাড়ি করার উপযোগী

- নিভৃত নিলয় আভান্তিকা
- নিভৃত নিলয় টি. হোসেন

রংপুর অফিস ঃ
এম. এ রাজ্জাক
জি,এল রায় রোড, কামাল কাছনা, রংপুর।
মোবাইল ঃ ০১৭১৯-০২৭২৩৯
ফোনঃ ০৫২১-৬১৪২৯ (অফিস)

ঢাকা অফিসঃ
জিয়াউর রহমান জিয়ান
আলম এন্ড সন্স
১১/১২ ইসলামপুর, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৫৩০৬

Mercantile Bank Limited

efficiency is our strength

বাংলার ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এর আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্প সমূহ

স্থায়ী আমানত প্রকল্প সমূহ

সঞ্চয় প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	জমাকৃত অর্থ	মুনাফা
ফ্যামিলি মেইনটেন্যান্স ডিপোজিট	১ /৩ / ৫ বছর	৫০,০০০/- অথবা এর গুণিতক	প্রতি ৫০,০০০/- টাকা আমানতের বিপরীতে প্রতি মাসে ৫০০/- টাকা প্রদান করা হয়
দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প	৫$\frac{১}{২}$ বছর	১০,০০০/- অথবা এর গুণিতক	৫$\frac{১}{২}$ বছরে দ্বিগুণ হয়
তিন গুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প	১০ বছর	৫০,০০০/- অথবা এর গুণিতক	জমাকৃত টাকা ১০ বছরে তিনগুণ এর বেশী হয়। প্রতি বছর শেষেও ভাংগানোর সুবিধা রয়েছে।

স্থায়ী আমানত (এফডিআর)

মেয়াদ - ১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস ও ১২ মাস
মুনাফা ১২.৫০%

মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প (ডিপিএস)

মেয়াদ	৫০০/-	১০০০/-	১৫০০/-	২৫০০/-	৫০০০/-	১০০০০/-	১৫০০০/-	২০০০০/-	২৫০০০/-
০৩ বছর	২১,৭৫০/-	৪৩,৫০০/-	৬৫,২৫০/-	১,০৮,৭৫০/-	২,১৭,৫০০/-	৪,৩৫,০০০/-	৬,৫২,৫০০/-	৮,৭০,০০০/-	১০,৮৭,৫০০/-
০৫ বছর	৪১,২৫০/-	৮২,৫০০/-	১,২৩,৭৫০/-	২,০৬,২৫০/-	৪,১২,৫০০/-	৮,২৫,০০০/-	১২,৩৭,৫০০/-	১৬,৫০,০০০/-	২০,৬২,৫০০/-
০৮ বছর	৮০,৭৫০/-	১,৬১,৫০০/-	১,৪২,২৫০/-	৪,০৩,৭৫০/-	৮,০৭,৫০০/-	১৬,১৫,০০০/-	২৪,২২,৫০০/-	৩২,৩০,০০০/-	৪০,৩৭,৫০০/-
১০ বছর	১,১৫০০০/-	২,২৩,০০০/-	৩,৪৫,০০০/-	৫,৭৫,০০০/-	১১,৫০,০০০/-	২৩,০০,০০০/-	৩৪,৫০,০০০/-	৪৬,০০,০০০/-	৫৭,৫০,০০০/-

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন : মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, রংপুর শাখা, প্রেস ক্লাব ভবন, স্টেশন রোড, রংপুর
ফোন : ০৫২১-৫১২৯৯ (পিএবিএক্স), ০৫২১-৫১৩২৩, ০৫২১-৫১১১০, মোবাইল: ০১৭১৩-২০১৬৩৬

এনবিএল

ডাবল বেনিফিট স্কীম

মাত্র ছয় বছরে দ্বিগুণ সংগে জীবন বীমা

স্বপ্ন নয়, বাস্তব। এখন মাত্র ছয় বছরে আপনার সঞ্চিত টাকা দ্বিগুণ হচ্ছে। আপনি যত টাকা দিয়ে স্কীম শুরু করবেন, ছয় বছর পর লাভসহ আপনি পাবেন দ্বিগুণ টাকা।

- ৫০,০০০/- টাকা অথবা এর গুণিতক যে কোন অংকের টাকা (সর্বোচ্চ ৫০,০০,০০০/-) দিয়ে হিসাব খোলা যায়। একই ব্যক্তি একাধিক হিসাব খুলতে পারেন।
- যুগ্ম/যৌথ নামেও হিসাব খোলা যায়।
- অভিভাবকের সাথে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুরাও হিসাব খুলতে পারে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ১৫৫টি শাখার যে কোনটিতে যোগাযোগ করুন

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয় ঃ ১৮, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৩০৮১-৫, ৭১৬৮৭২৯-৩১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৩৯৫৩
ই-মেইল ঃ ho@nblbd.com.

প্রাইম ব্যাংকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সেবা
'ALTITUDE' - Online Banking
যে কোন সময়, যে কোন স্থান থেকে

ডিপোজিট প্রোডাক্টস

প্রাইম মিলিয়নিয়ার স্কীম

প্রাইম মিলিয়নিয়ার স্কীমে ১০ বছর, ৭ বছর এবং ৫ বছর যথাক্রমে ৪,৫৭০ টাকা, ৭,৮৯০ টাকা এবং ১২,৪৬৫ টাকা মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপনি হতে পারেন ১০ লক্ষ টাকার গর্বিত মালিক।

- ছোটদের নামে এই স্কীম খোলা যাবে।

ডাবল বেনিফিট স্কীম

৬ বছরে দ্বিগুণ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর যারা দ্বিগুণ টাকা ফেরত পেতে চান এই স্কীমটি তাদের জন্য

- ন্যূনতম ২৫,০০০/- টাকা সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০ টাকা দিয়ে স্কীমটি খোলা যাবে।

লাখপতি ডিপোজিট স্কীম

লাখপতি ডিপোজিট স্কীম, সঞ্চয়ের সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও লাভজনক উপায়। এর আওতায় আপনি ১৫ বছর অথবা ১০ বছর অথবা ৫ বছর অথবা ৩ বছর মেয়াদির সঞ্চয় যথাক্রমে ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১,২৮৫ টাকা এবং ২,৪০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে স্কীম খুলতে পারেন।

- ছোটদের নামে এই স্কীম খোলা যাবে।

Prime Bank Limited
a bank with a difference
Rangpur Branch, Rangpur
Phone: 0521-64120